সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
কাব্য সংগ্রহ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
কাব্য সংগ্রহ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

C. সুভাষ মুখোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ
প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯
মুদ্রক : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬
দাম : বার টাকা

মেঘে মেঘে বেলা কম হল না। এ ধরনের সংগ্রহ মানেই খানিকটা শমনের ভয় ধরানো।

কাজেই সংগ্রহ বার করার প্রস্তাবে আমার দিক থেকে খুব একটা সায় ছিল না। কিন্তু স্নেহাস্পদ প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডলের উপরোধে শেষ পর্যন্ত ঢেঁকি গিলতে হল। এ সংগ্রহের সব দায় একা তাঁকেই সারতে হয়েছে। স্থানান্তরে থাকায় যথোচিত সাহায্যে লাগা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ছাপায় হয়ত কিছু ভুল ত্রুটি থেকে গেছে। পরবর্তী সংস্করণে তার নিরাকরণ করা যাবে। 'অগ্নিকোণে'র শেষ কবিতাটি হবে 'চিরকুটে'র শেষ কবিতা।

কবিতা হয়ত আরও লিখব। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ তো থাকবেই। সংগ্রহের কলেবরও ভবিষ্যতে হয়ত বাড়বে।

নাজিম হিকমতকে প্রতিধ্বনিত ক'রে পাঠকদের কাছ থেকে এই ব'লে আমি বিদায় নিতে চাই যে, 'আমার সবচেয়ে ভাল কবিতা আজও লেখা হয় নি।'

যার জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য
সেই অসমসাহসী
শের জঙ্গ-কে

সূচীপত্র

না জি ম হি ক ম তে র ক বি তা

প দা তি ক

মাপ করবেন, কত বয়েস ?

সাতাশ।

ও, তাহলে তো 'পদাতিক'-এরই সমবয়সী !

আপনি মনে মনে ভাবলেন—দেখলে ! কেমন কায়দা ক'রে 'পদাতিক'কে ছোকরা বানিয়ে দিলাম। তাছাড়া কথাটাও তো মিথ্যে নয়—সাতাশ বছর আগেই তো প্রথম 'পদাতিক' বেরিয়েছিল।

কাজেই তার টেবিলে স্বচ্ছন্দে কিছুক্ষণের জন্যে 'পদাতিক'কে আপনি বসিয়ে রেখে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন টেবিল ফাঁকা। চুলে কলপ না দেওয়ার জন্যে যখন আপনার আপসোস হচ্ছে তখন হঠাৎ একদিকে নজর পড়ল। দেখলেন—কী কাণ্ড !

আঠারো থেকে একুশ বছরের একরত্তি ছোকরাদের সঙ্গে দিব্যি জমে ব'সে গেছে 'পদাতিক'। আপনি ইশারায় ডাকছেন, কিন্তু সে-কথা তার কানেই যাচ্ছে না। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে আপনাকে সে এখন চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।

দেখলেন তো, টেবিল বদলে 'পদাতিক'-এর বয়েস কেমন সাতাশ থেকে একুশে নামিয়ে দিলাম ! কেননা তখন আমিও ছিলাম একুশ বছরেরই ছোকরা।

এই সাতাশ বছরে আমার বয়েস বেড়েছে। কিন্তু 'পদাতিক' সেই একুশেই আটকে আছে।

'পদাতিক'কে একমাত্র সেই কারণেই এখন আমি হিংসে করি।…

৬. ৩. ৬৭

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ :

এই পাঁচ বছরে আমার মনোভাব একটু বদলেছে। সুতরাং শেষ বাক্যের 'হিংসে' বদ্‌লে নতুন সংস্করণে 'স্নেহ' কথাটা বসাতে চাই।

সু. মু.

১০. ৬. ৭২

বাবা ও মা-কে

মে-দিনের কবিতা

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে—
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে।

প্রণয়ের যৌতুক দাও প্রতিবন্ধে
মারণের পণ নখদন্তে;
বন্ধন ঘুচে যাবে জাগবার ছন্দে,
উজ্জ্বল দিন দিক্-অন্তে।

শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা॥

সকলের গান

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?

আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি ?
ও-সব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া—
আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী,
অন্তত, আজ মাড়াই না তার ছায়া।

কুঁজো হয়ে যারা ফুলের মূর্ছা দেখে
পৌঁছয় না কি হাতুড়ি তাদের পিঠে ?
কিংবা পাঠিয়ো বনে সে-মহাত্মাকে
নিশ্চয়, নিঃসঙ্গ লাগবে মিঠে !

আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি ;
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে ;
আপাতত, চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে ॥

কানামাছির গান

একদা ছিলাম উচ্চ আশার কৈলাসে
ধূলিসাৎ বটে সে-বালখিল্য স্বপ্নরা ;
আজো হাসি, তাও মুখভঙ্গির অভ্যাসে
দগ্ধ হৃদয় হাওয়ায় মেলতে পথে ঘোরা।
নখদর্পণে নিকটবর্তী অলিগলি ;
প্রত্যাখ্যান জাগরূক রাখে প্রত্যাশা,
হৃদয়রাজ্যে অনাবশ্যক দলাদলি,
এ-অভাজনের ভবঘুরে তাই ভালোবাসা ।

হায়, ইতিহাস অর্থনীতির হাতে বাঁধা।
ভুলি বিপ্লব ক্রুদ্ধ প্রভুর রাঙা চোখে ;
মন যদি চায়, শীর্ণ শরীর দেয় বাধা
দ্বিধা-বিলম্বে হারাই লগ্ন ইহলোকে।
কৃষক, মজুর! আজকে তোমার পাশাপাশি
অভিন্ন দল আমরা। বন্ধু, আগে চলো—
সবাই আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী ;
এই দোলাচল দলকে কেবল পথ বলো ॥

২

একদা আষাঢ়ে এসেছি এখানে
মিলের ধোঁয়ায় পড়ল মনে।
গলিতে কি মাঠে কখনো ক্বচিৎ
দেখা দিয়ে যায় দখিন হাওয়া।

দৈবপ্রসাদে কবে সংসার
রুচি জনতায় গিয়েছে ভ'রে—

সকলে পারি না বাঁচতে, কাজেই
আপন বাঁচার পন্থা নেওয়া।

তাই দৈনিক নিজের কিংবা
পরের দায়েই শ্মশান চষি ;
মাটিতে নামিয়ে রঙিন গেলাশ
খুঁজি সফলতা তনুর শাখে।

মন থেকে আজ মিতালি উধাও
শরীর সে উপনিবেশ নিলো,
জটিল স্মৃতির পায়ে পায়ে তবু
হারানো প্রেমের ছায়ারা ঘোরে।

আমি ত্রিশঙ্কু, পথ খুঁজে ফিরি—
গোলকধাঁধায় বৃথাই ঘোরা,
জানি, বাণিজ্যে লক্ষ্মী। যদিও
ছিদ্রিত থলি ও-পথে বাধা।

কৃষক, মজুর ! তোমরা শরণ—
জানি, আজ নেই অন্য গতি ;
যে-পথে আসবে লাল প্রত্যূষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।

এখানে এসেছি আষাঢ়ে একদা
মিলের ধোঁয়ায় পড়ল মনে ;
কালবৈশাখী নামবে যে কবে
আমাদের হাত-মিলানো গানে ॥

রোম্যান্টিক

আগ্নেয়গিরি পাঠালো যে এই রাত্রি,
গলিত ধাতুরা জমাট কখন বাঁধবে ?
ব্যবসায়ী মন মাহেন্দ্রক্ষণ খুঁজছে,
টিকটিকি ডাকে,—বধির সে নির্বন্ধ।

ঘড়ির কাঁটায় কত যে মিনিট মরছে,
মনে অনন্ত সময়ের অধিরাজ্য ;
ভুলেছি, জ্যোৎস্না হারিয়ে হরিৎ ধান্য,
এখানে বন্দী আনা-তিনেকের বাল্‌বে।

ঘরে ঘরে সেই ভ্রমণ-বিলাসী ভাবনা
আরাম-চেয়ারে আনে দুপুরের নিদ্রা ;
নিজেরি একদা কল্পিত সব স্বপ্ন
সেলায়ের প্রতি সুতোয় লুকোয় লজ্জা।

ছেঁড়া জুতোটায় ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে
বেঁধে নিই মন কাব্যের প্রতিপক্ষে ;
সেই কথাটাই বাধে না নিজেকে বলতে—
শুনবে যে-কথা হাজার জনকে বলতে।

রাত্রি কিন্তু রাত্রিরই পুনরুক্তি
চাঁদের পাড়ায় মেঘের দুরভিসন্ধি ;
হৃদয়-জোয়ারে ভেঙে যায় সংকল্প
ম্লান হয়ে যায় সবহারাদের বস্তি ॥

বিরোধ

নিরাপদ এই নীড়ে বাঁধলাম নিজেকে
জানলায় নীল আকাশ দিলাম টানিয়ে,
মনের ঘোড়াকে ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে
চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের ঠিকানা।

সুবাসিত তেল কেশারণ্যের গভীরে
স্নান চলে বেশ নিরীহ টবের জলেতে,
শুকনো ডাঙায় নির্ভয়ে দিই মনকে
অতলান্তিক সাগরে সাঁতার কাটতে।

শাদা ডিশ্‌টায় স্বাদু হরিণের মাংস
মনের হরিণ সোনা হল কার নয়নে,
নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
নিয়েছে কখন যাযাবরদের সঙ্গ!

পুরু বিছানায় ডেকেছি ফ্যানের হাওয়াকে
নীল আলোটায় নীলিমার নীল স্বপ্ন,
হৃদয়ে উধাও বোশেখী ঝড়ের ঝাপ্‌টা
কালো কুয়াশায় দিক্‌বধূ কূল হারালো।

কখনো আবার মেরুযাত্রার কাহিনী
টেনে নেয় মন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে,
এখুনি বিরল বলয়ের ক্ষীণ শব্দে
দুঃসাহসিক স্বপ্নে পড়বে ছেদ কি?

ঈশ্বর, এই শরীর মনের দ্বন্দ্বে
এ কী নিষ্ঠুর নীরব গ্রহণ করেছো?
যেখানে ভাবনা তোমাকে সৃষ্টি করেছে
দৃষ্টি সেখানে দাঁড়ালো প্রতিদ্বন্দ্বী?

প্রস্তাব—১৯৪০

প্রভু, যদি বলো অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করব না ; নেব তীরধনুক।
এমনি বেকার ; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই ;
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।

হা-ঘরে আমরা ; মুক্ত আকাশ ঘর-বাহির।
হে প্রভু, তুমিই শেখালে পৃথিবী মায়া কেবল—
তাই তো আজকে নিয়েছি মন্ত্র উপবাসীর ;
ফলে নেই লোভ ; তোমার গোলায় তুলি ফসল।

হে সওদাগর,—সেপাই, সান্ত্রী সব তোমার।
দয়া ক'রে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও—
তারপরে, প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার।
জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।

অস্ত্র মেলে নি এতদিন ; তাই ভেঁজেছি তান।
অভ্যাস ছিল তীরধনুকের ছেলেবেলায়।
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বলব, বৎস ! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।

চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান॥

বধূ

গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো
পুরানো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বালা এ দিনশেষে।
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা
পড়ল মনে, খাসা জীবন সেথা—

সারা দুপুর দীঘির কালো জলে
গভীর বন দুধারে ফেলে ছায়া
ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
পেতেও পারো কাৎলা মাছ, প্রিয়।
কিংবা দোঁহে উদার বাঁধা ঘাটে
অঙ্গে দেবো গেরুয়া বাস টেনে
দেখবে কেউ নখ, বা কেউ জটা
কানাকড়িও কুঁড়েয় যাবে ফেলে।

পাষাণ-কায়া, হায় রে, রাজধানী
মাশুল বিনা স্বদেশে দাও ছেড়ে ;
তেজারতির মতন কিছু পুঁজি
সঙ্গে দাও, পাবে দ্বিগুণ ফিরে।
ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন
আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারি
—ব্যাকুল খিল সজোরে দিই তুলে।

ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম
উধাও ; লোকলোচন উঁকি মারে—
সবার মাঝে একলা ফিরি আমি
—লেকের কোলে মরণ যেন ভালো !
বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা ; তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো ॥

আদর্শ

উঁচু আঙুরের ঈষৎ আশাও করি না,
লক্ষ্য রেখেছি স্বনামধন্য ধ্রুবকে ;
উদাসী হৃদয় সুলভেই পাবে, হরিণা
রুপোর বাসনা মেটাবে জাপানি রূপকে ।

খুশি আমাদের, দিবানিদ্রার বদলে—
রেডিও তাড়াবে দুপুর মহিলা-আসরে ;
ভুখা সমাজকে ভাঁওতা দিয়েছি সদলে ।
—নাটক জমে না ও-সংক্ষিপ্ত আদরে ?

শুনি বটে পাঁঠা যোগ্য প্রেমের প্রসাদী—
চালাও, শ্রীমতী, বৈজয়ন্তী অবাধে ;
স্বেচ্ছায় পাবে যুবক সলিল-সমাধি,
দীর্ঘ আড্ডা জমবে জনপ্রবাদে ।

কৃত্রিম হ্রদ পায়চারি করি, চলো না।
মনান্তরের ঘটনা নেহাৎ ঘরোয়া,
প্রকাশ্যে হোক পরস্পরকে ছলনা—
লোকলোচনকে অন্তত করি পরোয়া।

সংশোধনের পথ বাৎলেছি শুঁড়িকে।
নাস্তিক নই,—নিষ্ঠা সটান ত্রিশূলে।
মার্জনা সব, ছুঁয়েছি যখন বুড়িকে—
নিঃসন্দেহে স্বর্গ, শরীর মিশুলে।

বনগমনের বয়সটা নয় নিকটে
নির্বাণ-লোভে মঠ তো সঠিক—সময়ে।
অসীম সিন্ধু মাপি আজ এক বিঘৎ-এ
নিজগুণে সেই ত্রুটি সামান্য, ক্ষমো হে।

মানি অহিংসা, মেনেছি অসহযোগিতা ;
নায়ক অধুনা কংগ্রেসি মনোনয়নে—
সাহিত্যে শখ, পড়ি না ভ্রষ্ট কবিতা ;
শিব, সুন্দর স্পষ্ট নিমীল নয়নে।

জনান্তিকেই বুলি কপচানো খাসা তো,
চতুষ্পদেই তীর্থ করেছি যোজনা ;
বহ্বারম্ভে বজ্র যেদিন হাসাত,
সেইদিন ভেবে আমাদের অনুশোচনা।

সম্মতি নেই মজুর ধর্মঘটেও,
ভাংচি ঘটায় শৃগালবুদ্ধি ভাড়াটে ;
মাথা ঘামাব না চেক-চীনা সংকটেও
তবেই দেখবে ঈর্ষ্যা বাড়বে পাড়াতে॥

পলাতক

মেঘেদের হাত ধ'রে আমার উধাও যাত্রা গ্রহ হতে গ্রহে ;
আমার চক্রান্ত শুধু ট্রামের চাকার নিচে দুর্ঘটনা আনে
চন্দ্রাহত যুবকের ; আমার অক্লান্ত গান নক্ষত্র বিরহে ;

নির্জন মাঠের চিন্তা ছুঁড়ে দিয়ে বিকালের মিছিলের পানে,
শহর বিস্বাদে ঢেকে, ডাকি : 'ঝাউ-ঝুমঝুমির ছায়ায় এসো হে,
প্রজাপতি পায় না কো এরোপ্লেনের শব্দ বাতাসের কানে' ;

মর্তের আকাঙ্ক্ষাদল ছিঁড়ে দিয়ে পরীদের পাখার পিছনে,
অদৃষ্টের অন্ধ খাদে জীবনকে ছেড়ে এসে অবসাদভরে,
বিষাদের বিষলিপ্ত কবিতাকন্যারে ধার দিই জনে জনে ;

প্রণয়ের কাহিনীকে প্রবৃত্তির হাতে বেঁধে মুহূর্তের জরে
মহৎ প্রচ্ছদ দেওয়া ; তারপর পিঠ রেখে সম্মুখ জীবনে
বিশ্বস্ত হৃদয় খোঁজা,—সকল শূন্যতা যাতে প্রেম হয়ে ঝরে ;

পশ্চিমের লাল মেঘ অন্ধ হয় পৃথিবীর আশ্চর্য খামারে,
হলুদ ঘাসের প্রান্তে ট্রামের নিষ্ফল সুর দীর্ঘমান তারে ॥

নির্বাচনিক

ফাল্গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক্ বদলাবে।
কথোপকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি,—
"অবশ্যকর্তব্য নীড়।" (মড়াকাটা ঘর,—স্থানাভাবে ?)

নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী ; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হ'ত হাবভাবে।
বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙ্গুল স্বপ্নে অশরীরী।

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাসা চিজ !—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ !

'জীবন বিস্বাদ লাগে !'—ইত্যাদিতে ইতস্তত দেনা।
এবার আত্মাকে, বন্ধু, করা যাক প্রত্যাহার। (অহো !
সম্প্রতি মাঘের দ্বন্দ্বে ছত্রভঙ্গ দক্ষিণের সেনা।

সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগপত্র পাঠাবে না ?)

নারদের ডায়রি

ডায়মণ্ডহারবার থেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দা হাওয়ারা
ইতিমধ্যে কলকাতায় : একুত্রিশে চৈত্রেই চম্পট,—
প্রকাশ, তাদের ইচ্ছা। (এ-বিষয়ে নিরুত্তর তারা।)

হৃদয় সম্পর্কে হবু দম্পতির হিং-টিং-ছট ;
ফাল্গুনী সনাক্ত করে শিরোধার্য বৈমানিক পাড়া ;
বাহান্ন হাতির শুঁড়ে হাঁচিগ্রস্ত অহিংস শকট।

বাপুজি, দক্ষিণ করে আনো যুক্তরাষ্ট্রের মিঠাই ;
সাঙ্গ, প্রভু, সত্যাগ্রহ ? একচ্ছত্রে বেজেছে বারোটা ?
শেষে কি নৈমিষারণ্যে পাবে আত্মগোপনের ঠাঁই ?

নিষিদ্ধ খনির গর্ভে লালকোর্তা সূর্যের বারতা ;
ঈশ্বর-ব্যক্তির টিকি পাবে না কো নাস্তিক চড়াই ;
আদালত সচ্চরিত্র ; রেস্তোরাঁয় আড্ডা তাই ভোঁতা।

(বসন্ত কী আর্য আহা ! এসপ্ল্যানেডে আশ্চর্য জনতা।)

দলভুক্ত

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা ; লেনিন দিবস ; লাল-পাগড়ি মোতায়েন ;
আতঙ্কিত অন্তরাত্মা ; ইষ্টনাম জপে রক্তচক্ষু মাড়োয়ারি ;
নির্ভীক মিছিল শুধু পুরোভাগে পেতে চায় নির্ভুল গায়েন ;

ইতিহাস স্পষ্টবক্তা ; ভারী ট্যাঁক কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের ভাঁড়ারী ;
কড়ায়-গণ্ডায় ধূর্ত অধ্যাপক গোয়েন্দার প্রাপ্য গুনে নেন ;
'সবি তো শূন্যের রঙ্গ' ফিরঙ্গ পাড়ায় সন্ধ্যা দেখে হাওয়াগাড়ি ;

স্বপ্ন-স্বর্গ অকর্মণ্য মগজের ; চন্দ্রাহত জব্দ কাঁটা-তারে ;
হাতুড়ি বিদ্যুৎগতি ! বিস্ফোরক স্ফুলিঙ্গেরা গম্বুজে লাগুক ;
ধ্রুবলক্ষ্যে হামাগুড়ি কতকাল ? কতকাল কল্কির আকারে ?

ব্যর্থমনোরথ পাণ্ডা ; পিণ্ডে তৃপ্তি নেই আর ; জাতিস্মর ভুখ ;
ধনতন্ত্রে নাভিশ্বাস ; পরিচ্ছন্ন স্থান তার প্রস্তুত ভাগাড়ে ;
(সাবাস্ বল্লভ ভাই ! প্রকাশ্যেই নেড়ে দিলে গান্ধীর চিবুক)

হাজরা পার্কে সভা কাল ; নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ ॥

বাস্তিক

তবে কি নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, কমরেড ?
বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে ঘূর্ণিফল গাছে ;
পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরৎ দেখায়।
আকাশে অসংখ্য টর্চ ; মেঘেরা ফেরার—
গোলদীঘির গর্তে চাঁদ ধরা প'ড়ে গেছে।
বসন্ত সত্যিই আসবে ? কী দরকার এসে ?
বছর-বছর দেখা দিয়েছে সে ক্যাম্বেলের ভিড়ে ॥

পণ্ডশ্রম

অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরু-খোঁজা ক'রে
নীলাকাশে, অন্ধকারে গৈরিক নদীতে ;
তারপর আত্মহারা অধিক রাত্রিতে
যখনি দিয়েছি সাড়া যে-কারো ইঙ্গিতে
তখনি পিছন থেকে বলেছে বিদায়
ভগ্নমনে সচ্চরিত্র গুপ্তচর কোনো ॥

পণ্ডিতমূর্খ

লেনিন, এঙ্গেলস, মার্ক্স নখাগ্রে আমার
উত্তরাধিকার সূত্রে অন্যতম নেতা।
লক্ষ্য বড়ো ; ধরি তাই মহাত্মার ধামা ;
আনন্দ-ভবনে খুঁজি মুক্তির উপায়,
প্রতিদ্বন্দ্বী, ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছি কেমন !
এবার বিধ্বস্ত চীন মন্দ লাগবে না ;
—ভারতবর্ষে বিপ্লবের দেরি নেই আর ॥

পদাতিক

(সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী-কে)

যেখানে আকাশ চিকন শাখায় চেরা
চলো না উধাও কালেরে সেখানে ডাকি,
হা ! হতোস্মি সড়কে বেঁধেছি ডেরা
মরীচিকা চায় বালুচারী আত্মা কি ?

লাল মেঘ গুহা পাবে না হয়তো খুঁজে
নিজেরে নিখিল মিছিলে মিলাও যদি,
চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
হব অপরূপ অপরাহ্নের নদী।

হরিণ সময় লাগামে বাঁধতে পারো ?
বিশ শতকেও ফুলের বেসাতি করি,
অতল হ্রদের মিতালি হৃদয়ে গাঢ়
হিংসুক হাওয়া দেহে আঁকে চক্‌খড়ি !

প্রতিবেশী চাঁদ নয় তো অনাত্মীয়
রামধনু-রং দেশেও জমাব পাড়ি,
মাঠের শিশির ঝরবে না একটিও
ক্রীতদাস ছায়া গোটাবে না পাত্‌তাড়ি।

২

জানি : পলাতক পাখায় নভশ্চারী
খোঁজা নিষ্ফল নক্ষত্রের ঘাঁটি ;
ফাঁকা ভাঁড়ারের ওস্তাদ সংসারী—
আর কতদিন ঢাকবে ধোঁকার টাটি ?

পিরামিডে থাক পিরীতি কফিন-ঢাকা,
অহল্যা হোক পিচ্ছিল হাতছানি,
প্রগল্‌ভ যুঁই মেলুক বন্ধ্যা শাখা,
চাঁদের চোখেতে পড়ুক অন্ধ ছানি।

উপবাসী রাত অক্ষম অভিনেতা।
হৃদয় হাঙর-যক্ষ্মাই ঠোকরাবে!
ফসলের দিন সামনে কঠিনচেতা—
অবৈতনিক বেড়েই তা টের পাবে।

বুঝেছি : ব্যর্থ পৃথিবীর পাড় বোনা।
স্বপ্নের ভাঁড় সামনেই ওলটানো।
তামাসা তো শেষ। পারের কড়িও গোনা—
কঙ্কালখানা কালের স্কন্ধে টানো।

৩

শ্রীমতী, আমার অরণ্য-স্বাদ
মেটে এখানেই। লেকে সন্ধ্যায়
গোচারণ ঘাসে প্রার্থী যুবক।
কমণ্ডলুতে কারণ, তাই তো
ওঁ তৎসৎ,—প্রলাপ মানেই।
ফরাসী রাজ্য ভালো লাগে, তাই
সংসার-ত্যাগ। লাল ত্রাসে কাঁপে
গ্রেসিয়ার দিন। পেশোয়ারিদের
করকমলেই ভবলীলা শেষ।

৪

(উঞ্ছজীবী ডাস্টবিন নির্জন ব'লেই)
অনেক আগ্নেয় রাত্রে নিষিদ্ধ আমরা

দেখেছি বৈষ্ণব বেনে অকৃপণ হাত দেয় পণ্য যুবতীকে।
অবশ্য নেপথ্যে চলে নিরামিষ নাচ আর গান।
কখনো নিষ্ঠুর হাতে তারা কিন্তু মারে না কো মশা একটিও।

(আমরা কয়েকটি প্রাণী,—দুচোখে ঘুমের হরতাল।)
মাঝে মাঝে শোনা যায় ভবঘুরে কুকুরের ঠোঁটে
নতুন শিশুর টাটকা রক্তিম খবর!

(তন্বী চাঁদ ক্রোরপতি ছাদের সোফায়!)

চীনা লালসৈনিকের শরীরে এখন
নিবিড় নির্বাণ-বিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনেট?
বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে—
মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

সুপুষ্ট ঈশ্বর শুনি উষ্ণীষ আকাশে
পুঁজি রাখে আমাদের অর্জনের রুটি—
(শাদা মেঘ তারি কি স্বাক্ষর!)
মৌমাছির মত ব'সে কতিপয় নক্ষত্র নাগর
নিশাচর স্ফূর্তির চূড়ায়।

উচ্চারিত ক্ষোভে তাই বিস্ফোরক দিন
ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে
বিপ্লব ঘোষণা ক'রে গেছে।

তবুও আড্ডায় চলে মন দেয়া-নেয়ার হেঁয়ালি।

প্রতিদ্বন্দ্বী সব্যসাচী ডবল-ডেকারে
(চাক্ষুষ আমার দেখা) ফাল্গুনী কবিরা
অর্ধেক চাঁদের মত কী করুণ চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

অহিংসা পরমো ধর্ম নীলবর্ণ শৃগালের দলে।
টাকার টঙ্কারে শুনি : মায়া এ-পৃথিবী।
জীবের সুলভ মুক্তি একমাত্র স্বস্তিকার নিচে।
সংগ্রাম নিশ্চিত, তবু মাসতুতো ভায়েরা
বিষম সন্ধিতে আজ কী চক্রান্ত চৌদিকে ফেঁদেছে।

আজকে এপ্রিল মাস,—(চৈত্র না ফাল্গুন ?)
ভ্রষ্ট নোগুচির নিন্দা চড়াইয়েরা ভনে।

৫

অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়
এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর
গলিতনখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।
ততদিন আত্মরক্ষার প্রাচীর হোক
প্রত্যেক শরীরের ভগ্নাংশ।

জীবনকে পেয়েছি আমরা, বিদ্যুৎ জীবনকে।
উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন কাটুক যৌথ কর্ষণায়
আর ক্ষুরধার প্রত্যঙ্গ তরঙ্গ তুলুক কারখানায়।
দুর্ঘটনাকে বেঁধে দেবে কর্মঠ যুবক
নিখুঁত যন্ত্রের মধ্যতায়।

অরণ্যকে ছেঁটে দেবার দিন এসেছে আজ।

তবে, যুদ্ধ আজ।
রাজন্যের অনুকম্পা নেই,
প্রজাপুঞ্জের স্বপ্নভঙ্গ।

বণিকপ্রভু চোখ রাঙায়,
কারখানায় বন্ধ কাজ।

(ইতিহাস আমাদের দিক নেয়।)

উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে না কি
আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে ?

শ্রেষ্ঠীবিলাপ

দৈব কৃপণ, মেলে না কো কৃপা, বিধাতা বাম ;
প্রস্তুত চিতা ; মরণ কামড়ে খুঁজি আরাম।

রাজার কিস্তি মাৎ, সম্প্রতি বেনে বেচাল ;
আদি আড্ডায় ফিরবো ? প্রবল শত্রু কাল।

স্বখাত সলিলে কথিত যখন ধ্রুব নিধন—
সখা, অন্তত ডাঙায় ছড়াব নিষ্ঠীবন।

কোটালের করকমলে সঁপেছি ধর্মঘট
উদ্ধত বুট ভাগ্যে জোটায় শুধু হোঁচট।

চাঁদকে আমরা বেঁধেছি চাঁদির সা-রে-গা-মায়,
অবৈতনিক প্রণয় রাখি নি ত্রিসীমানায়।

জনজাগরণে সদলবলেই মেনেছি হার –
হে বল্‌শেভিক, মারণমন্ত্র মুখে তোমার।

ইতিহাস দেশ-বিদেশে ক্ষিপ্র ধরে কৃপাণ ;
বন্দরে দল গড়েছে শ্রমিক, গ্রামে কৃষাণ।

রোখো বিপ্লব, লাল ঝাণ্ডার করো নিপাত ;
হে দীনবন্ধু, নইলে সমূহ কড়ি বেহাত।

বালুতে ব্যর্থ বেঁধেছি কালের অগ্রসর ;
লুপ্ত কুয়াশা, বিজয়ী রৌদ্র হল প্রখর।

হে প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্ব করো গ্রহণ—
তীক্ষ্ণ সঙিনে আজ ঘনিষ্ঠ অভিবাদন॥

ধাঁধা

বড়ই ধাঁধায় পড়েছি, মিতে—
ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গ্রামে ;
বার-বার ধান বুনে জমিতে
মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে।

মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে
সুখে ধরি গান ছেলেবুড়োতে।

একদা কাস্তে নিই সকলে।

লাঠির আগায় পাড়া জুড়োতে
তারপর পালে আসে পেয়াদা।

খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা॥

অতঃপর

সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, ইতস্তত ভূসম্পত্তি আছে নিম্নস্বাক্ষরকারীর। এ-দুর্দৈবে জমিদারি রক্ষা দায়। বংশপরম্পরাগত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভুবনে ঈশ্বর চালান, চলি।

পেয়াদারা বশম্বদ : প্রবঞ্চক আদায়ের প্রত্যেক ফিকির তাদের কণ্ঠস্থ আজো। অথচ বকেয়া খাজনা প্রজারা দেয় নি গত দুই-তিন সনে। আদালতে ফল অল্প।

যৎসামান্য আয় আজো বন্ধকীতে। ভিক্ষাপাত্র নির্ঘাৎ নতুবা। বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশবিদ্যা কলকাতায়। বোতলে আগ্রহ তার অবশ্য অগ্রিম —পৈতৃক বলাও চলে।

বিপদ একাকী নয়কো!—সচ্চরিত্র, কিন্তু ক'টি বুদ্ধিহীন যুবা নিরক্ষর চাষাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ করে। দুশ্চিন্তায় আমাদের হাত-পা সব হিম। (সাম্যবাদী দল এরা?)

এতৎসত্ত্বেও হয়তো গুরুভাগ্যে ঘুরে যাবে অদৃষ্টের চাকা। ইংরেজ প্রভুর নেত্রে সর্ষেফুল? আমাদের হাতে আসবে রাজ্যভার? চমৎকার কিবা! ধনীদের তো পোয়া বারো।

বিশেষত,—ভারতবর্ষে একচেটিয়া নেতা গান্ধী। গৌরীসেনী টাকা ভবিষ্যৎ ভাবে ধ্রুব। মহাশয়,—জমিদারি যায় যাক! বণিকের মৌলিক প্রতিভা দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে।

এ-বিষয়ে পত্রপাঠ যুক্তি চাই।

ইতি। বঙ্গচন্দ্র পাল। ঢাকা॥

চীন : ১৯৩৮

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও
লাল নিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক।

মেরুদণ্ডের কাছে ঈপ্সিত খাড়া ইস্পাত
বোম্বেটেদের টুঁটি যেন পায় জিঘাংসু হাত
বীর্যবানের বিজয়ের পথে খোলা সব লোক
দিকে দিকে শ্যেনদৃষ্টিকে, দেখ, মেলে সাধু বক।

দিশাহীন ঝড়ে, জানি, তুমি যুগবিপ্লবী মেঘ
তড়িৎ কাটুক তোমাদের দ্রুত চলবার বেগ
উজ্জ্বল ইতিহাসে নিষ্ফল পশ্চাৎ শোক
লোকান্তরেই নেবুলার সাথে সন্ধিটা হোক।

প্রান্তিক লোভে পরজীবীদের নিষ্ঠুর চোখ
প্রাক্‌পুরাণিক গুহাকে ডাকলো ক্ষুরধার নখ,
কমরেড, আশু অশ্বের ক্ষুরে আনো লাল দিন
দম্পতি রাত ততদিন হোক উৎসবহীন।

দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে বাঁধবে না কেউ ?
ফসলের এই পাকা বুকে, আহা, বন্যার ঢেউ ?
দস্যুর স্রোত বাঁধবার আগে সংহতি চাই
জাপপুষ্পকে জ্বলে ক্যান্টন, জ্বলে সাংহাই ॥

এখানে

সেই নাগরিক ধূসর জীবন
পিছনে ফেলে
সব থেকে দ্রুত ট্রেনে ক'রে আজ
এখানে আসা।
—আসানসোলে।

এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়
পড়েছে ভেঙে,
পাহাড়ের গায় সারি সারি সব
চিমনি চূড়ো।
ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে—
খাড়া ক'রে কান কাস্তের শান
শুনছে নাকি
কামারশালে?

ঊর্মিল ভুঁই হাঁটে বনহীন
তেপান্তরে;
সরু সরু ঘাস, শিরে বুঝি তার
শিশির ঝলে!

দুই দিকে দূর বালুদের দেশ,
মধ্যে নদী
শ্বাস টেনে টেনে পায়ে পায়ে রাখে
চিকন রেখা।

নির্জন মাঠ, হঠাৎ কোথাও
তারের বেড়া;

সর্পিল পথে চলে রেলপথ
ধনুক-আঁকা
দেশান্তরে।

দিনের পাহারা সন্ধ্যায় সেরে
সূর্য দেখি
অতিকায় তার ডানা মেলে কালো
পাহাড় থেকে
ক্লান্ত চোখে।

তাড়িখানা খোলা ; রাস্তায় খালি
লোকের মেলা।
স্ত্রী-পুরুষ মেলে মুখোমুখি শুধু
মুখর ভাঁড়ে।
কারো অসহ্য নেশা কাড়ে শেষ
কপর্দকও।
বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া গ্রাম,
পুরানো ভিটে
স্মরণে নামে।

দূরে সিঙ্গি গাছ ; ধানক্ষেত তার
কিনার ঘেঁষে।
কিছু নয়, তারা তবু কী স্বপ্ন
রচনা করে।
গরের সেই নীড় ছেড়ে এসে
এখানে ভাবি,
সিনেমা ছায়ায় রাজধানীতেই
ছিলাম ভালো।

যাদের রক্তে উড়ছে আকাশে
মিলের ধোঁয়া,
মুষ্টিমেয়ের খেয়ালেই এই
ভরা ভুবনে
তাদের ভোলা ॥

কিংবদন্তী

চলছিলো এতকাল বেসাতি
নিরাপদে বেশ এ-দাস দেশে।
আজকে ঢেউয়ের অলিগলিতে
যমদূত দেয় ডুবসাঁতার।
আদার ব্যাপারী তাই বুঝি না
জাহাজের হালচাল কিছুই।
কেবল গ্রাম্য হাটবাজারে
ভেসে আসে কানে ক্ষীণ গুজব ॥

বানপ্রস্থ

পঞ্চাশ পার ; এবার প্রিয়—
সামনে বনের বাঁধা সড়ক।
এতকাল নেতা ছিলে যদিও,
মিটেছে সঙ্গে চলার শখ ;
বিপ্লবী ! পাতো উত্তরীয়
রাজগৃহে ! তাই লাগে চমক।

ভিক্ষায় যদি সুফল ফলে,
লাভে আছো ষোল আনা শরিক।
গড়ি পল্টন খনিতে, কলে
প্রাণভয়ে দেখি কাঁপে বণিক।
তাই বলি প্রিয়, হাতবদলে
আমাদের নেই সুখ অধিক।

যতই বাহবা নাও কাগজে,
জানি অন্তর দিচ্ছে তুয়ো
গৃহযুদ্ধের ভয় মগজে
মরে না কো উঁচু আশা তবুও।
তাই শত্রুর তপ্ত ভোজে
হে প্রিয়, ধরেছো ঠাণ্ডা ধুয়ো ॥

ঘরে বাইরে

বর্গীরা আসে এদেশে বোমারু পুষ্পকে
শহুরে মোড়ল হুঁশিয়ারি হাঁকে সাইরেনে।
চকিতে বিজলী আলোরা অন্ধ রাজপথে—
বণিকেরা ক্লীব উদ্ধার খোঁজে অলকাতে।

আমরা বেকার, ঘর নেই, এই দুর্যোগে
মন বিষণ্ণ; শরীর টলছে উপবাসে।
নিরস্ত্র হাত; অসহায় মুঠি তুলি ক্ষোভে—
নিরুপায়ে চাই আকাশে, দৈবে নেই আশা।

সহসা মাভৈ শোনা গেল চড়া সাইরেনে
স্বদেশে দিয়েছে চম্পট ভীরু বর্গীরা।
পান্থপ্রদীপ জ্ব'লে ওঠে যেই রাজপথে,
মোড়ে মোড়ে লাল-ফতোয়ায় দেখি নব আশা!

নিই উজ্জ্বল উষার ঠিকানা লোকমুখে॥

আর্য

দুর্ভিক্ষ, বন্যার চক্রে যথাপূর্ব চলি।
কপর্দকহীন প্রাণধারণের থলি
মন্ত্রমুগ্ধ পতনের দুঃস্বপ্ন দেখায়।
পাণ্ডববর্জিত দেশ যদ্যপি আমার
তবু বুঝি, কালের জাহাজ
বাণিজ্যবায়ুর হাতে শুধুমাত্র ক্রীড়নক আজ।

সরল বিশ্বাসে যাই সপ্তাহান্তে হাটে
খাদ্যের দ্বিগুণ দাম দোকানীরা হাঁকে।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ ;
ফিরি শূন্য হাতে।

গুরুগিরি বংশগত পেশা—
নতুন শিষ্যের টিকি মেলে না কো ; পুরাতন চেলা
শতহস্ত দূরে রাখে। আফিমের নেশা
পিণ্ড পায় না কো আজ।
কুলীন ব্রাহ্মণ আমি ; ওস্তাদ ঘটক—
পশ্চিম দিগন্তে ধরি অষ্টমীর পাণি।
সম্বরণ করো আজ, হে ঈশ্বর, করুণা তোমার।

ভিড়গ্রস্ত তরণীতে ভারগ্রস্ত আমি
সংসারসমুদ্রে হালে পাই না কো পানি।
তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই,
আমাকে সৈনিক করো তোমাদের কুরুক্ষেত্রে, ভাই॥

চিরকুট

মুখবন্ধ

আছি বেশ, গৃহপালিত জীবনে দিচ্ছে হানা
উপবাসী অপমৃত্যু, তবুও মিলিত আশা—
অনাগত কোনো দিনের দুপাশে মেলেছে ডানা,
তাই নিয়মিত সভায় মিছিলে যাওয়া আসা।
আমাতে বন্ধু পায় হরতালী কারখানা,
চোখে আগ্নেয় বিশ্বাস, গ্রামে জাগছে চাষা,
লড়াই চলছে দূর দেশে, তবু তার আওয়াজ
শুনছি ভিক্ষাভাণ্ডে এখানে ; লাগে অবাক
মাঠে নিধিরাম সর্দারদের কুচকাওয়াজ।
দুর্বল স্মৃতি ; বীররসে তাই কাঁপে ব্যারাক,
প্রেত পল্টন, জালিয়ানবাগ প্রয়াগ আজ,
স্বরাজে সেলামী মিলবে : প্রভুরা পেটায় ঢাক।
অধুনা সরস ঘুষ জিভে, অহো! বন্ধবাক্॥

কাব্যজিজ্ঞাসা

১

সেদিনকার শাণিত ধার হারিয়েছি
হৃদয়ে শুধু স্মৃতির ভার, ভিড় শুধু
বেড়াই ঘুরে পাড়ায় আপন খুশিমত
লঘু মেঘের মতন তনু মেলে যদি।

জন্মে আর জীবনে আর তৃপ্তি নেই
মরণে মধুসমাপ্তির ক্ষীণ আশা

সকলি মানি অলীক এই গ্রহলোকে
ইন্দ্রিয়ের ধাঁধায় বাঁধা শরীর মন।

নিরুদ্দেশে আকাশে বৃথা খুঁজি বাসা
আলোর কোনো চিহ্ন নেই চরাচরে
দিনের ভাঙা সেতুর শেষে পরপারে
সূর্য গেল,—মুখর ফের পান্থনীড়।

২

নিজেই নিজের ছায়ার পাশে
চমকালে মিছে, নিজেকে চিনে
নামাও বল্‌গা পিপাসু ঘাসে,
রুক্ষ মাটিতে, মেঘলা দিনে
শুধুই ধূম্র ইচ্ছাধীনে
কতকাল মেঘ আকাশে ভাসে?
তাই বিষণ্ণ তোমাকে দেখে
হঠাৎ পেলাম ইশারা কোনো
হালকা-স্বভাব হৃদয় থেকে,
হে দিগ্‌ভ্রান্ত, আজকে শোনো
তোমাকে সঁপেছি শরীর মনও
সেদিন চোখের মুকুরে রেখে,
ঘরছাড়া মন তোমার, কবে
চকিতে নিখোঁজ পালাবে মাঠে
—তাই শঙ্কিত হৃদয়, তবে
দয়ালু বিধিও সঙ্গে হাঁটে।
যদি কিছুকাল যুগলে কাটে
ঘরমুখো মন তবেই হবে,
হে দিগ্‌ভ্রান্ত, আমি তো বুঝি—
তোমার জটিল হারানো পথে

বাতি যে ধরবো সেটুকু পুঁজি
আলেয়ার নেই। আমার মতে,
এসো আজ এই জটিল পথে
ঠিকানা বদ্‌লে প্রণয় খুঁজি।

৩

ভেঙেছে সংসার স্বর্গ ; কণ্টকিত স্বপ্নের বিছানা,
পাঠালো নিষ্ঠুর সূর্য গলিত মৃত্যুর পরোয়ানা
আমাদের মোমের টুপিতে।
ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয় আকাশের সুনীল বিষয়,
উদার সমুদ্র ডাকে—
ঢেউয়ের ইশারা গিলি অন্ধকার গলির রোয়াকে,
হাতে হ্রস্ব জীবনের জরিপের ফিতে।
ছড়ানো দুঃখের মধ্যে কিছু নিয়ে কাব্যের জগৎ
রচনা করার ইচ্ছা ছিল বটে, ভেঙেছি শপথ—
বৃত্তি আজ একান্ত বিবাদী,
মনে মনে উড্ডীন আকাশে বাসা বাঁধি,
কেবলি নিষ্ফল বাদ্য ছিদ্রময় ঢাকে
পুরানো অভ্যাসবশে চিরুনীর পণ্ডশ্রম টাকে,
তবুও তোমার কাছে ঋণী
একদা আমার এই একচক্ষু হৃদয়হরিণী,
তোমার উষ্ণতা দিল বাষ্পময় আমাকে শরীর
উচ্ছল পর্বতগাত্রে ধর্ম তাই উদ্দাম নদীর
তবুও তুষারচক্রে পিঠে এ কী জরাগ্রস্ত কুঁজ—
দূরে দেয় হাতছানি সঙ্ঘবদ্ধ মাঠের সবুজ,
ছত্রভঙ্গ রৌদ্র হয় ফিকে
উদ্যত সঙীন দিকে দিকে।

৪

জাগুন জাগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হুহু
মগজে প্রভূত দম্ভ তবু তো
আহা উহু।
মনের মহল দিচ্ছে টহল
মিঠে কুহু
এখনো জাগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হুহু।

৫

ভাঙলো চিবুক-ঠেকানো হাতের নিদ্রা—
বাগানে শুকনো কঙ্কালসার বৃক্ষ,
খিড়কির পথে পালাবে কি কলাবিৎরা ?
—গ্রামে ও নগরে ভিড় করে দুর্ভিক্ষ।
হৃদয়বিহীন সময়ের দুর্বৃত্ত
তোমার আমার মধ্যে দাঁড়ালো আজ যে,
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেয় আজ ভীরু চিত্ত
কাপুরুষ ভয় আনবো না মোটে গ্রাহ্যে,
বুঝেছি দগ্ধ জীবনের দৃষ্টান্তে—
প্রাণ বাঁচানোর নেইকো সহজ পন্থা,
বজ্রমুঠিতে শৃঙ্খল হবে ভাঙতে,
আমাদের ফাঁকা ভাঁড়ার প্রেমের হন্তা,
বিদায় ! অলীক স্বপ্নের প্রজাপুঞ্জ !
বিদায় ! চাঁদের নিরুদ্দিষ্ট কুঞ্জ !

৬

বাতাস পিঠে চাবুক হানে আকাশ আনে বজ্র
শান্তি কবে ফুঁকেছে শিঙে—বেজায় ঢিমে কান তো!!
শহরে, গ্রামে, নিকটে, দূরে নানান সুরে শুনছি—
পেয়েছি তার খানিক রস, খানিক অস্পষ্ট :
"একলা নই, মিলিত হাত আজ আঘাত হানবে।
মুক্তিদাতা মজুর চাষা—নতুন আশা সামনে।
চলো না কবি মিছিলে মিশি—অসৎ ঋষিসঙ্গ
পতনে পথ করেছে ঢালু, গড়েছে বালু সৌধ,
আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি, খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
লক্ষ বুকে রয়েছে খনি, কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।
আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ॥"

গ্রাম্য

শুনেছি একদা সোনালি ধানে
আকাশ তপ্ত সূর্য আনে,
বিকালে হালকা হাওয়ার নাচে
হৃদয়ে স্ফূর্তি হয় ছোঁয়াছে।

সম্প্রতি গ্রামে আছি, কোথাও
প্রাণোৎসবের নেই নিশানা
উপবাসী চাষা, ধান উধাও
মহাজনদের পন্থা জানা।

আঁকাবাঁকা পথে দেখছি রোজ
পান্থ জনের লটবহর,

পথে ভিক্ষায় চলেছে ভোজ
চোখে চিত্রিত দূর শহর।

শ্মশানে হৃদয় বিলানো বৃথা
মাথা সামলানো দায় যে, মিতা
তার চেয়ে এসো ধরি কুঠার
শত্রু পরশু করুক ধার॥

চিরকুট

শতকোটি প্রণামান্তে
হুজুরে নিবেদন এই—
মাপ করবেন খাজনা এ-সন
ছিটেফোঁটাও ধান নেই।

মাঠে মাঠে কপাল ফাটে
দৃষ্টি চলে যতদূর
খাল শুক্‌নো, বিল শুক্‌নো
চোখে লোনা সমুদ্দুর।

হাত পাতবে কার কাছে কে
গাঁয়ে সবার দশা এক
তিন সন্ধ্যে উপোস দিয়ে
খাচ্ছি ক'দিন বুনোশাক।

পরনে যা আছে তাতে
ঢাকে না কো লজ্জা

ঘটি বাটি বেচেছি সব—
নিজের বলতে ছিল যা।

এ দুর্দিনে পাওনা আদায়
বন্ধ রাখুন, মহারাজ
ভিটেতে হাত না দেয় যেন
পাইক-বরকন্দাজ।

হাজারখানেক প্রজা আছি
আমরা এই মৌজায়
সবাই মিলে ঠিক করেছি
কেমন ক'রে বাঁচা যায়।

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
কে খাজনা শুধবে ?
হুজুর, এবার না বাঁচালে
আগুন জ্বলে উঠবে ॥

গ্রামে

সকালসন্ধ্যা গড়াগড়ি দিই গাছতলাতে
পাথর এ প্রাণ তবুও গলে না বৃষ্টি, তাতে
গৃহে গঞ্জনা ; প্রকৃতিকে ভালোবাসছি তাই—
ভাবালু বাতাস আদৌ সয় না শহুরে ধাতে ;
কাজ মেলেনিকো, গ্রামে বসে কষে তুলছি হাই,
আসে বসন্ত ; অন্তরে দাবদাহের ছাই।

যেখানে ধাঁধার মত অলিগলি টানে জনতা,
কর্মখালির আশাতে হাঁটুর কাটে জড়তা,
যেখানে মিলের গাঁথুনি আকাশে হাত বাড়ায়—
সেখানে ফুরালো গরীব গ্রাম্যজনের কথা।
অশরীরী সাধ ভূতপূর্বেই আজো বেড়ায় ;
ঢিমে এ জীবন তড়িৎ গতির চমক চায়।

জমিজমা গেছে ; শেষে বন্ধক থালা-বাসন,
উপবাসে দেখি একে একে মরে আপনজন।
বাল্যবন্ধু ছিল যারা, গেছে নিরুদ্দেশে—
অখ্যাত ফুল রাস্তা ঢেকেছে, ঝরে শ্রাবণ,
স্মৃতির জাবর কাটতে একলা আমি এদেশে,
পালাবার পথ বন্ধ ; প্লাবনে যাচ্ছি ভেসে ॥

সীমান্তের চিঠি

তোমাকে ভুলি নি আমি
তুমি যেন ভুলো না আমায়।
তোমার সহস্র চোখ
চেয়ে আছে তারায় তারায়।

পর্বত দাঁড়ায় পাশে
অগ্নিবর্ণ বনের সবুজ ;
— এখানে প্রস্তুত আমি,
প্রতিশ্রুত আমার পৌরুষ।

তোমরা অক্লান্তকর্মী মাঠে মাঠে,
তোমাদের হাতের ফসল
ক্ষুধিত মজ্জায় মেশে—
আমাদের বাড়ায় কদম।
শত্রুর শিবিরে হানি
তোমার হাতের বজ্র।

শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দিকে দিকে
এখানে আমার মনে
জ্বলে অনুকম্পাহীন ঘৃণা।
শত্রুর জ্বলন্ত চোখে দেখি
জীবনদক্ষিণা॥

এই আশ্বিনে

পথের দুদিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল ;
গ্রাম করে খাঁ খাঁ—
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে
ভগ্নদূত শাঁখা।

রক্তচোষা দিগ্বিজয়ে ফেরে—
বন্দরে বাজায় ডঙ্কা
চরাচর মৃত্যুজালে ঘেরে।
চোখে তার অনুর্বর
অন্ধকার ঢাকা
গায়ে তার শবগন্ধ,
পদতল চিতাভস্মে রাখা।

উপবাসরুক্ষ হাড়ে
শিহরিত বজ্র কান পাতে।
উন্মত্ত বন্যার স্তম্ভ ফাঁপে
রুষ্ট কৃষ্ণ মেঘে কাঁপে
কটাক্ষের স্খলিত বিদ্যুৎ,
পৃথিবী প্রস্তুত।

দিকে দিকে জয়োদ্ধত
জীবনের উদ্দাম ঘোষণা।
দুহাতে ছড়ায় সূর্য
প্রাচুর্যের মুঠো মুঠো সোনা।

রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে
ফেটে পড়ে
আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল
পুলকিত অরণ্যের
মন্ত্রমুগ্ধ নীলাক্রান্ত পাখি
নিরুদ্দিষ্ট শূন্যে পাখা মেলে।

অবরুদ্ধ তরুশাখা
চঞ্চল হাওয়ায় মাথা কোটে।
দুরন্ত মনের ইচ্ছা
আরক্তিম ফুল হয়ে ফোটে।

মরাগাঙে কলোচ্ছ্বাসে
নেমে আসে অস্থির জোয়ার।
করাঘাতে খুলে যায়
জীবনের রুদ্ধ সিংহদ্বার।

আগত দিনের স্বপ্ন
সূর্যের ললাটে
আদিগন্ত চষে-ফেলা মাঠে
আগন্তুক অঙ্কুরিত পদচিহ্ন আঁকে।
অরণ্যের ডালে ডালে
বাজুবন্ধে বেঁধে দেয় পর্ণচূড় রাখী
আলাপে মুখর হয় পাখি।

পরাক্রান্ত শত্রু আছে,
মুখোশের অন্তরালে শানায় সে নখ,
জীবন যাত্রার পথে হানে সে কণ্টক,—
পায়ে তার মৃত্যু বাঁধা
লোভ তার বাঁধানো সড়ক।

ক্ষমা নেই—
শোকাকূল সন্ধ্যাকাশে মোছা
এয়োতির আরাধ্য সিঁদুর।
কাঁধে কাঁধ সান্নিধ্যে দাঁড়াও,
হাতে হাতে বজ্র হানো
ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও :
—শৃঙ্খলের কলঙ্কমোচন।

স্বাগত

গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধানবোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।
সূর্য পাটে বসেছে কখন।
রাখালের দেখা নেই—
কোথাও গরুর পাল ওড়ায় না ধুলো ;
ঢেঁকিতে ওঠে না পাড়,
একটি কলসীও জল ওঠায় না ঘাটে।
বুনোঘাসে পথ ঢাকে,
বিনা শাঁখে সন্ধ্যা হয়,
সূর্য বসে পাটে।
তাঁতি তাঁত বোনে নাকো,
কলু আর ঘোরায় না ঘানি ;
কুমোরের ঘরে চাবি,

ঝাঁপ বন্ধ, নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানী,
হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে
ভস্ম মেখে পড়ে থাকে বেকার হাপর।
যে পথে কামার গেছে
কে জানে সে পথের খবর ?
শীতের আমেজ আসে ;
জ্বলে না আগুন চণ্ডীমণ্ডপের কোলে।
হাতে হাতে ঘোরে নাকো হুঁকো
চুলোচুলি হয় নাকো মোড়লে মোড়লে।
নিশুতি রাত্রিতে কারো
চৌকি শুনে কুকুর ডাকে না,
দিগন্তের বনস্পতি হাত নাড়ে,
মাঠের সোনালি ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে।
দুচোখে প্রতীক্ষা তার,
স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে।
ওঠে ডাক শহরে শহরে।
রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে
মাঠের ফসল দিন গোনে।
প্রতিজ্ঞাকঠিন হাতে
একে একে তারা সব
চোখের শোকাশ্রু মুছে ভাবে—
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।
পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধনেত্রে
ধান আর ধান॥

স্বাক্ষর

নির্মেঘ আকাশে এক রক্তাক্ত সমরে
অন্ধকার ধুঁকে ধুঁকে মরে।
এখনো ওঠে নি সূর্য, রুক্ষ কাক ডাকে,
পথের ঘুমন্ত স্রোত ওঠে।
সঙ্গীচ্যুত পড়ে থাকে
জীবনস্পন্দনশূন্য নিশ্চল শরীর।
চোখে তীব্র অভিযোগ,
ভিক্ষাপাত্রে দুটি হাত স্থির ;
ঠোঁটে তার বিস্ফারিত ক্ষুধিত আত্মার
কঠিন দস্তুর অভিশাপ।

শোকাশ্রু ঝরে না কারো,
উচ্চারিত হয় না বিলাপ ;
পাশে শুধু অট্ট হাসে
লোভাতুর জন্তুর ভ্রূকুটি,
বাৎসল্য নিহত, প্রেম পরাভূত—
দন্ত কুটি কুটি।
ছিন্নভিন্ন উদ্বাস্তু সংসার ;
মর্মন্তুদ এ দগ্ধ মেদিনী।

মনে হয় চিনি
উৎকর্ণ ফসল বার বার
শুনেছিল ওর পদধ্বনি।
চোখে ওর ছিল এক আগন্তুক দিনের উচ্ছ্বাস।
হাতে ওর ছিল বিশ্ব ঐশ্বর্যের খনি—
বুকে ছিল বিপুল বিশ্বাস,
ওর কাছে ঋণগ্রস্ত আমার ধমনী।

শূন্য পেটে নেমে আসে
ছায়াচ্ছন্ন নিপুণ শৃঙ্খল,
চেতনা হয়েছে আজ ক্রমেই দুর্বল ;
প্রকাশ্য আলোয় দেখি—
দরদীর ছদ্মবেশ ধরে
শত্রুর দালাল,
গোপনে আটক রাখে অন্ধকার ঘরে
লক্ষ মণ চাল ;
অন্য হাতে অগ্নিগর্ভ প্ররোচনা।
নির্মেঘ আকাশ ; ঐ আসে !
অরক্ষিত রথচক্র,
স্খলিত বজ্রের নিচে
শতাব্দীর দেশগর্ব সর্বনাশে কাঁপে !
হত্যাকারী হাসে !
অস্থির আঙুলে দিন গোণে
পায়ে তার লুণ্ঠিত শ্মশান,

জানি তবু জয়োদ্ধত মুক্তির নিশান,
আন্দোলিত জনস্রোত প্রবল প্রতাপে
নিজের মুঠিতে আজ নিয়তিকে টানে।
সম্মিলিত হাত তুলে আনে
উন্মুক্ত আলোয় অন্ধ ঘরের ফসল।
দৃঢ়পণ প্রতিরোধে, নিরন্নের ত্রাণে
ছুটে আসে সেবাপ্রাণ বাহু।
মাঠে মাঠে ক্লান্তি নেই, অসংখ্য লাঙল
নবান্নকে ডাকে।
যদিও সম্মুখে ঝড়
কণ্টকিত আসে বিপর্যয়,
তবু জানি আমাদের জয়,
অমর প্রতিজ্ঞাপত্রে রাখি সেই দিনের স্বাক্ষর॥

আহ্বান

সীমান্তে উদ্যত খড়্গ
নিরস্ত্র দেশের বুকে অগ্নি জ্বালে প্রভুত্বের মদমত্ত বুট।
ঐক্যবদ্ধ জনতার হুংকৃত জোয়ারে
অহংকৃত মুখের চুরুট—
চোখের পলকে ভেসে যাবে।
আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের জবাবে
মুক্তির দেয়াল দেবে দৃপ্ত প্রতিরোধ,
দৃষ্টি কালো কুয়াশায় হয়েছে দুর্বোধ—
শতাব্দীসঞ্চিত ঘৃণা খাঁকির পোশাকে, স্টীল হেলমেটের গায়
আগুন বাগায়।
ঋণগ্রস্ত চাষীদের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ যোগালো
বিষম বিক্ষোভ, তাই
লাঙলে কাটে না মাটি দুর্বল দুহাতে শ্লথ মুঠি।
বস্তির গলিত প্রান্তে ওঠে হাঁই—
অসহায় জীর্ণ ঘরে উপবাসী মৃত্যুর ভ্রূকুটি।
কোটি কণ্ঠে গান স্তব্ধ ; নিরুদ্যম, নিস্তেজ ধমনী—
অবরুদ্ধ ক্ষমতার খনি,
এখনো নিষ্ক্রিয় বসে আছো ?
নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকো, রক্তে তার জ্বলুক আগুন ;
শৃঙ্খলিত সেনাপতি, শূন্য আজ তূণ ॥

রুল ব্রিটানিয়া

পার্কে দোঁহে বসেছিলাম ঘাসে
খাঁচার পাখি কাছেই ছিল বাঁধা,
হাওয়াই রথ হঠাৎ দিল হানা
অগ্নিবাণ ছড়ালো চারপাশে।
প্রভু, সবই তো লীলা তোমার, তাই—
আকাশে বুঝি এমন রোশনাই!
বীর হৃদয়, লাগলো তবু ধাঁধা॥

নগররক্ষা

দেশরক্ষায় অধুনা মত্ত মন,
ভাঁজি বেপরোয়া হাওয়ায় ভারী মুগুর।
শত্রু কখন আসবে হে জনগণ,
ভেবে ভেবে ঘুম করছি নামঞ্জুর

নাম রটে গেছে নিধিরাম সর্দার
বাজারে চলতি দেশসেবার এ হাল
স্বয়ং পুলিশ কর্তা, কেয়ার কার?
সময় আসলে মিলে যাবে তরোয়াল

কতকাল বল অলীক আশায় মাতি
(সেই সূত্রেই ছেড়েছি চরকা, খাদি)
নগররক্ষা পাছে স্রেফ হয় মাটি
ঝাড়ুদারদের লড়াইতে বাদ সাধি।
ইতিমধ্যেই মিলেছে কিন্তু লাঠি॥

বিয়োগান্তক নাট্য। বিদায় সর্দার।
অহিংসার ট্রেডমার্কা অচল এবার।
দেশভক্তি আমাদের সওদাগরী চাল
(সর্বত্র সশস্ত্র কিন্তু দলবদ্ধ লাল !)
ভারতবর্ষে স্ফূর্তি নেই। বাকি সব দেশে
প্রজারাই মরে, বেনে ব্যাঙ্ক ভরে ঠেসে।
কেবল অভাগ্য আমরা। লড়াই পালিয়ে
দিল্লী আর সিমলা করি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে।
প্রতীক্ষা বিফল। জানি, যা হবে হবার,
এবার করতেই হবে এস্পার ওস্পার।
বাহবা, যথার্থ স্বচ্ছ তোমার প্রস্তাব—
ততক্ষণ প্রভুদের দেখি হাব ভাব,
পুনশ্চ প্রার্থনা এই রাখি, অতঃপর
আমার অহিংস ছাগে দিও না নজর ॥

শত্রু

সূর্য অস্ত যায় না এমন রাজ্যে—
(সম্প্রতি বুঝি টলায়মান সে-ভিত্তি !)
প্রায়োপবেশন দৈনন্দিন কাজ যে।

না চেয়ে বরাতে জুটেছে বেকারবৃত্তি
দুরদৃষ্টকে আনি না আদৌ গ্রাহ্যে,
স্মরণে জাবর কাটছে পুরানো কীর্তি।

চিনেছি শত্রু, রয়েছি প্রভুর পক্ষে
(নতুবা শাসন চলতো ভগ্ন স্বাস্থ্যে)
খাদ্যখাদক কোলাকুলি করি সখ্যে।

গতিবিধি বাঁধো বেড়াজালে উদয়াস্তে
বাঁচবেই গণতন্ত্র এই যা রক্ষে
যুদ্ধের ধার শুধবে হাতুড়ি কাস্তে,

সাবধান! যারা চাইবে বক্র হাস্যতে॥

জনযুদ্ধের গান

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ,
রুখবো দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।

এদেশ কাড়তে যেই আসুক
আমরা সাহসে বেঁধেছি বুক,
তৈরী এখানে কড়া চাবুক,
চলছে কুচকাওয়াজ।

একলা তবু তো পাঁচ বছর
চীনের গেরিলা লড়ছে জোর,
তাই তো শহরে, গ্রামে কবর,
পাচ্ছে জাপ বহর।

আমরা নই তো ভীরুর জাত
দেব না কো হতে দেশ বেহাত,
আজকে না যদি হানি আঘাত
ডুববে ভাবী সমাজ ॥

প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার

নিষ্ঠুর কালের মুঠি—
ভেঙেছে ঘটনাচক্রে ছত্রপতি মন্ত্রীর ফিকির
একে একে কুচক্রান্ত, মিউনিকের নিভেছে দেউটি,
ব্যর্থ সব দুধকলা, কালসর্প হয়েছে করাল,
অবশেষে রাজ্য-বানচাল।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ ; (কারণ তারা তো জানতো :
আঠারো ঘা লাল বাঘা ছুঁলে !)
এদিকে বেড়েছে বৈরী কলির গোকুলে।
শকুনির নখরে নখরে
উন্মত্ত হিংসায় লুব্ধ লালা ঝরে।
ক্রমে তার আত্মঘাতী লোভ
বিপ্লবের রক্তিম ভূগোলে
বিস্ফোরক রূপসজ্জা খোলে।
আকাশে সমুদ্রে স্থলপথে
থরো থরো শোভাযাত্রা উলঙ্গ মৃত্যুর,
অরণ্যপর্বত শোনে রণচণ্ডী সাঁজোয়ার নহবতে আজ
আদিম গুহার সুর।
সারি সারি ট্যাঙ্ক আর চাকার ক্রেংকার,
পর্ণচূড় হেলমেটের গায়
উজ্জ্বল সূর্যের আলো জ্যোৎস্নাও ঠিকরায়।

কর্কশ হ্রেষায় ওঠে একদিকে হিংস্র গর্জন—
অপহরণের পেশা নির্বোধ দস্যুর নেশা
চোখে অন্ধকার ঠেকে আপন দেশের গুপ্তধন।
আর এক দিগন্তে জ্বলে ঘৃণার শাণিত প্রতিরোধ—
পদতলে স্খলিত শৃঙ্খল,
ঘরে ঘরে ফসলের নবান্ন উচ্ছল—
সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের নক্ষত্র খচিত সমারোহ
মুক্তির প্রহরী আজ।
এ হাতে শৃঙ্খল দুঃসহ ;
গেরিলাও লাগায় চমক—
বন্দরে, বাজারে, গোঠে সূচিমুখ বর্শার ফলক।
প্রতিধ্বনি ওঠে দেশে দেশে—
শ্রমিক, কৃষাণ, ছাত্র তরঙ্গিত সৈন্যদলে মেশে ;
ছায়া ফেলে দুষ্টগ্রহ খনিতে খামারে—
সাম্রাজ্য ছড়াবে।
দিকে দিকে মৃত্যুপণ অঙ্গীকারে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত আরাবে
শকুনিচক্রের বুক কাঁপে।
অচিরেই ভেঙে যাবে শত্রুর আচ্ছন্ন দেশে কুম্ভকর্ণ ঘুম—
সঙ্ঘবদ্ধ জনতার ক্ষিপ্র জাগরণ
ছিঁড়ে দেবে শয়তানের আকাশকুসুম
হেড্রিকের হত্যাকাণ্ডে সেদিনের দ্বারোদ্ঘাটন।
এখানেও তাই আজ প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার,
গড়ে তুলি দুর্জয় প্রাকার ;
সম্মুখ সমরে লাল পল্টনের খুন
মুক্তির পদাঙ্ক রাখে।
আত্মোৎসর্গের সেই পবিত্র আগুন
আমাদের রক্তে এসে লাগে, চট্টগ্রাম জানে তার ভাষা ;
বিশাখাপত্তন জ্বলে। (ভাঙে খাল কেটে বাজীমাতের দুরাশা ?)
—ইতিহাস পথ নিলো কুটিল পদ্মার বাঁকে বাঁকে ;
বারুদে জোয়ার লাগে, পীতাঙ্গে গোঁয়ার বান ডাকে—

এশিয়ার সূর্য ওঠে দোর্দণ্ডপ্রতাপ।
আর্তনাদ করে নিচে অগণিত প্রজাপুঞ্জ ;
লুণ্ঠিত খামার, বন্ধ বাক্যালাপ, ভূলুণ্ঠিত গাছের গোলাপ—
মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়ার প্রাণ যায় যায়,
মালয়, বর্মার ভাগ্যে পরাভব ;
বিশ্বাসঘাতক প্রভু নিয়েছে বিদায়।
জাগ্রত চল্লিশকোটি এখানে তৈয়ার।
ধারালো সঙীন দেবে বিজয়ী স্বাক্ষর
গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মৃত ধনতন্ত্রের কবর।
যে ক্লীব পালাবে তার মুক্তি নেই আর।
দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধীচির হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার—
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার॥

চীন

শত্রুপক্ষ হার মানে।
বিধ্বস্ত চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে
ভূমিষ্ঠ নতুন শক্তি। জনতার দুরন্ত প্রতাপ—
বিভক্ত প্রবাহ মেলে ;
ছত্রভঙ্গ পরাক্রান্ত জাপ।

গ্রামে গ্রামে
নগরে নগরে
গোলায় খামারে আর বাজারে বন্দরে
অরণ্যে পর্বতে জনবাহিনীর তরঙ্গিত ভিড়
—ওঠে আত্মরক্ষার প্রাচীর।

বজ্রের দাপট কণ্ঠে, বাহুতে পৌরুষ—
স্বপ্নে জাগে ছিন্নপত্র সংসারের ছবি,
চোখে জ্বলে বিপর্যস্ত উত্তরপুরুষ।

শৃঙ্খল দুহাতে দেবে ?
—এখনো কোমরবন্ধে রয়েছে কার্তুজ।
কঠিন প্রতিজ্ঞা নেয় মাঠের সবুজ।
অতর্কিত গেরিলার উচ্চকণ্ঠ গানে
শত্রুর হৃৎকম্প জাগে ; ভগ্নদূত দুঃসংবাদ আনে :
'ফসলের সূচিমুখে দৃপ্ত বাধা ; প্রতিবন্ধ চিম্‌নির হাঁ-মুখ।
অরণ্যের ডালে ডালে বর্ধিত চাবুক।'
হিংস্র পশু মাটি চায়—
এশিয়ার হবে দণ্ডধর।

হঠকারী আক্রমণ নিষ্ঠুর থাবায়।
সে লুব্ধ দুরাশা ভাঙে ;
চীনের পল্টন আজ দুঃসাহসী খুঁড়েছে কবর।
শরীরে সঙীন ফোটে,
রক্তের ফোয়ারা ছোটে,
আকাশের নিচে ওঠে প্রতিধ্বনি :
'এ দেশ আমার।'
শয়তানের দম্ভ ভাঙে ; দিকে দিকে শাসানো তর্জনী।
দুর্জয় প্রাকার।

প্রতিরোধ! জনস্রোতে বিক্ষুব্ধ টাইফুন ;
হাত তোলে বজ্রমুঠি,
বুকে খনিগর্ভের আগুন।
ইতিহাস প্রতিশ্রুত ; কাঁধে কাঁধ মিলিত জীবনে
ক্রান্তি দিন গোণে।

লুপ্ত আজ গৃহযুদ্ধ, বিভীষণ ব্যর্থমনে করেছে প্রস্থান।
সাবাস সিয়ান।
চিয়াঙের চোখে আজ অখণ্ড চীনের মৃত্যুপণ।

বিপ্লবের রক্তপথে জানি আসে উজ্জ্বল আগামী ;
শয়তান যদিও আনে অনশন, দুঃখের প্লাবন—
হে চীন! তোমার পাশে আমি।

শত্রুপক্ষ হার মানে
বিজয়ী চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে।
সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুনের, পথে পথে রক্ত দেয় চীন—
ভূগোলে অবাধ আজ পদক্ষেপ সশস্ত্র মুক্তির,
মৈত্রীর সংকল্প নেয় সুতীক্ষ্ণ সঙীন।
অথর্ব নায়ক হবে গদিচ্যুত—
দ্রুতগতি ইতিহাস,
ক্রমেই কদম তার হয় যে অস্থির॥

স্টালিনগ্রাড

এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখে নি কখনো
বসন্ত গলিতপত্র ;
বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎখচিত ;
রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ।
ছুটে আসে পঙ্গপাল শত্রুর জোয়ার
ট্যাঙ্ক, মৃত্যুঝলকিত কামান, সওয়ার।
লুব্ধ চোখ ঝলসায় আগুনে ;

মাথায় স্খলিত বজ্র,
কঙ্কাল পরায় গ্রন্থি পায়ে।
বিশাল গম্বুজ ভাঙে ;
দেখা দেয় দিগন্তে সবুজ।
প্রাণতুচ্ছ প্রতিজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ রথী
দাঁড়ায় নগরদুর্গে।
দেশপ্রেম ধমনীতে, বিশ্ববোধ ধ্যানে ;
ক্ষিপ্রগতি পরাক্রান্ত হাতের পরশু।
ফেরে লুব্ধ পশু .
মিটেছে রাজ্যের ক্ষুধা ;
প্রাণ তার বিশ্বময় মৃত্যু-আতঙ্কিত,
স্টালিনগ্রাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর ;
তাই তো নদীর স্রোতে, অগ্নিদগ্ধ মাঠে
মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ অক্ষর ॥

বর্ষশেষ

সূর্য বসে পাটে।
কঙ্কালবিক্ষিপ্ত খালে
দ্বারস্থ কবরে ঘর-জ্বালানো শ্মশানে
জনশূন্য হাটে মাঠে
সীমাহীন নিরুদ্দিষ্ট আলে
পিছনে মূর্ছিত পথ।
সম্মুখে দাঁড়ানো কোন্ ভবিষ্যৎ,
কোন্ প্রতিশ্রুতি ?
হাতে দুঃখহরা কোন্ বিশল্যকরণী ?

প্রেম আজ ভুলেছে শপথ
অনাবৃত লজ্জা ঢাকে অন্ধকার শুধু,
স্মৃতি হানে কাঁটার মুকুট ;
দ্বিধা হতে চেয়েছে ধরণী।
নিথর নিশ্চল জল হারানো দীঘির
—ভারাক্রান্ত চোখে ঢেউ লাগে।
ভাগ্য আজ হয়েছে বধির।
পথে পথে ভগ্নস্তূপ,
চক্রবৎ ফিরেছে মড়ক।
দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা যমদূত
মুহুর্মুহু কড়া যায় নেড়ে
রক্তলোভাতুর শিবা গন্ধে গন্ধে ফেরে।
দিশাহীন জীবনের গোলকধাঁধায়
দুমুঠো অন্নের মোহে
গ্রাম ছুটে চলেছে শহরে।
ভিটা শূন্য পড়ে,
আকাশের কণ্ঠরোধ করে পদধুলি।
ক্রূর অট্টহাসি খেলে
সওদাগরী ডিঙায় ডিঙায়।
রাখাল এখন দূর শহরের কুলি।
মাঠে মাঠে ধরেছে ফাটল,
আপন দর্পণে মুখ দেখে রসাতল।
পিছনে পাষাণবৎ অন্ধকার ভাঙে
সম্মুখে টলায়মান দেয়ালে দেয়ালে
মুষ্টিবদ্ধ হাত এসে লাগে।
আগে চলো, আগে—
তরঙ্গে তরঙ্গে বেগ
বজ্র দাঁতে কাটে মেঘ
অরণ্য বাড়ায় বাহু শিলাবৃষ্টিঝড়ে

কঠিন মাটিতে ক্রুদ্ধ পদশব্দ,
আগে চলো, আগে।
অন্তরীক্ষে গুরু গুরু প্রতিধ্বনি জাগে।
পর্বতের চোখে জাগে সাড়া—
আকণ্ঠ ধূমায় বহ্নি
ঠেলে ওঠে অনর্গল লাভা।
বেত্রাহত অন্ধকার শিহরায় ভয়ে—
আকাশে আকাশে ফোটে আরক্তিম আভা।
লক্ষ কণ্ঠে হুঙ্কারিত জয়ে
অন্ধকার যবনিকা দুহাতে সরায়।
ওঠে সূর্য দেশে দেশে
রক্তপদচিহ্ন তার
দিক থেকে দিগন্তে গড়ায়॥

উজ্জীবন

"আমার প্রশংসায় কাজ নেই—
ধর্ম-অধর্মের অতীত
কার্যকারণ থেকে পৃথক
অতীত অনাগত বর্তমান থেকেও ভিন্ন
যা তুমি জানো
আমাকে বলো।"
—যমের প্রতি নচিকেতা (কঠোপনিষদ)

যৌবনের পদপ্রান্তে যে কৈশোরের ছিন্নশির উপহার দেয়
বসন্তকে পুড়িয়ে মারে দাউ দাউ দাবাগ্নি শিখায়
যে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় স্বপ্নের দড়ি নাকে দিয়ে
বঞ্চনার অভিশপ্ত পথে,

পিচগলা প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম করে
ভুপায়ে শহুরে বর্ষার বন্যা ঠেলে ঠেলে
মহল্লা থেকে মহল্লায় যে ছুটিয়ে নিয়ে যায়,
যে তার শত্রুকে ফাঁসীতে না লটকিয়ে
অদৃশ্য উদ্বন্ধনের পাকে পাকে জড়ায়—
পথে পথে কঙ্কাল স্তূপীকৃত করে
বন্দুকের নলে জনসমুদ্রে আগুন ছড়িয়ে
একটি ফুটন্ত কিশোরের স্পর্শাতুর হৃদয়
উত্তেজনায় আর অসহ্য বেদনায় ছিন্নভিন্ন ক'রে
একটি কিশোরের আশ্চর্য কণ্ঠের কাকলি স্তব্ধ ক'রে দিয়ে
মাটির বুকে টেনে আনে এক ঝলক রক্ত
তারপর সমস্ত শরীর জুড়ে সাদা কাপড় বিছিয়ে
মৃত্যুর গুণকীর্তন করে—
        সুকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে
        পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে
        তোমাকে বাঁচাবো ॥

জবাব চাই

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই
ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে ?
আমাদের দাবী কে রোখে, কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে ?

শিকলে বেঁধেছো, হাত দিলে শেষে মুখের গ্রাসে
শয়তান, চাও ভাঙতে কলিজা গুলিতে গ্যাসে ?
পার পাবে না কো, দেওয়ালে ঘোষণা : শেষ লড়াই—
বারুদে লাগালে আগুন যখন, পুড়ে হও ছাই।

দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের ভিৎ পড়ো-পড়ো।
যুগসন্ধির মোড়ে মোড়ে ভুখা-নাঙ্গারা জড়ো—
শানানো কাস্তে, হাতুড়ির মুখে সোজা জিজ্ঞাসা :
দুশো বছরের রক্ত শুষেও মেটে নি পিপাসা ?

বজ্রনিনাদে ঘরে ঘরে আজ পৌঁছায় ডাক,
যেখানে যে আছে ময়দানে সব এক হয়ে যাক।
কড়াপড়া হাতে শিকল ভাঙার শপথ কঠিন।
আমাদের হবে কলকারখানা, জায়গাজমিন।

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই।
ব্রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে ?
আমাদের দাবী কে রোখে ? কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে ?

পনেরোই ফের আসবো

জেনো, পনেরোই আগস্ট আবার আসবো।
দেখে নেবো কার বিচার কে করে
কে দেখে দলিলপত্র কার ?
ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো যখন
বন্দীশালার দেয়ালও সকলে ভাঙবো
পনেরোই ফের আসবো।

রোখে পনেরোই আগস্ট সাধ্য কার ?
আজ চব্বিশে জুলাই রুখতে পারলো ?
পথে পথে বান ডাকলো যখন

ছাত্র-যুবক-চাষী মজুরের
কণ্ঠে গর্জে উঠলো—
ছাড়াতেই হবে বন্দীদের।
বজ্রের সেই আওয়াজ রুখতে পারলো ?

যতদিন বীর বন্দীরা জেলে থাকবে—
শান্তি আমরা মানবো না।
মিছিলে সভায়, দেয়ালে দেয়ালে
সকলের দাবী আমরা ধ্বনিত করবো।

লাল অক্ষরে লিখে রাখলাম পনেরোই
কিছুতেই কেউ ভুলবো না।
পনেরোই ফের আসবো।

এক আগস্টে সঙীনের ঘায়ে
বারুদের মত জ্বলেছিলাম।
শহরের পথে গ্রামে ও গঞ্জে
বন্দীশিবির আমরা ভাঙতে চেয়েছিলাম।

এই আগস্টে আবার আমরা জ্বলবো—
কারায় কারায় লৌহ-শিকল ভাঙবো
বদ্ধ তালার চাবি কার হাতে,
কার ঘাড়ে কত মাথা আছে খুঁজে দেখবো
এই আগস্টে পনেরোই ফের আসবো ॥

ময়দানে চলো

স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! যেখানেই থাকি, ময়দানে হবো সকলে সামিল আজকে
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! একবার লাখো হাত এক হোক, দেখে নেব পশুরাজকে ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! দোকানে কপাট, দপ্তরে চাবি, ট্রামবাসে চাকা বন্ধ ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! বিজলীর চোখ গেলে দাও, করো চৌরঙ্গীকে অন্ধ ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! ডাক্‌-তার-ভাই ! টেলিফোন বোন, ভয় নেই,
পাশে আমরা
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! দুঃশাসনের পাঁজর খুলবো, গা থেকে খসাবো চামড়া ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! আর সব ডাক বন্ধ, একটি ডাক শুধু চালু থাকবে :
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! আগুনের মুখে একটি জবাব সকলে তৈরী রাখবে ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! একপাও পিছু হটবো না কেউ, করুক রক্তারক্তি ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! পথে পথে আজ মোকাবিলা হোক, কারদিকে কত শক্তি ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! সাদাকে করবো কালাপানি পার, তবে যুদ্ধের শান্তি ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! শৃঙ্খলে চিড় ধরে, ভিৎ টলে, মাথা উঁচু করে ক্রান্তি ॥

স্ফুলিঙ্গ

রুখবে কে আজ চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
বদ্ধ মুঠিতে বজ্র তৈরী, মিছিলে হাঁটি ।
জমিজমা নেই, উপবাস পেশা, কেয়ার কার ?
অগ্নিগর্ভ ভাষা আমাদের গানের ঘাঁটি ।

একা নই, আছে সঙ্গে পাথুরে-পেশি হাজার ।
হাতে হাত বাঁধা, চড়া গলা, পায়ে জোর কদম,
দুচোখে প্রখর সূর্যপ্রহার ; ভেঙেছে ভ্রম—
শত্রুর টুঁটি ছিঁড়বে এবার নখের ধার ।

আমরা শহর বানাই, আবাদ করি ফসল
ফলে নেই হাত, উপরি পাওনা পিঠ কুড়োয়।
মুমূর্ষু গ্রাম ; বর্গীর ভয়ে প্রাণ জুড়োয়
পুঞ্জিত ক্রোধ, রক্তে হিংস্র জ্বলে অনল।

ঝড় আসন্ন, আকাশে মেঘের কুচকাওয়াজ,
আজ আমাদের মুঠোর নাগালে শুভ অশুভ ;
পরোয়া করিনে দৈবকে, জানি বিজয় ধ্রুব ;
উঁচু আশমানে ভাসে নিষিদ্ধ কথার ঝাঁঝ।

রুখবে কে আজ ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
ছুটে আসে যারা বঞ্চিত, কাঁধে কাঁধ মেলায়
হতাশ জীবনে ধরে হাতিয়ার, কেয়ার কার ?
ওঠে আগুনের হলকা, ক্ষিপ্র ছুটে চলায়॥

ঘোষণা

এদেশ আমার গর্ব,
এ মাটি আমার কাছে সোনা।
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।
এখানে আমার পাশে
হিমাচল,
কন্যাকুমারিকা।
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ঐক্য
প্রতিজ্ঞা পরিখা।

দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ,
রক্তচক্ষু রাজার শাসন—
শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু,
মুঠোয় শিথিল সিংহাসন ;
সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু
শবের গলিত গন্ধ ছোটে।

প্রজাপুঞ্জ ওঠে ;
আগুন লেগেছে ঘরে,
খরসূর্য মাথার উপরে।
ভাণ্ডারে উধাও খাদ্য,
শূন্য পেটে চাষবাস চুপ
কারখানায় পড়েছে কুলুপ।
দোকানে দ্বারস্থ অক্ষৌহিণী।
পিছনে করুণমূর্তি পথের কাহিনী।
গহনঅরণ্য আরাকান ;
স্খলিত পায়ের ছন্দে
স্পন্দিত শ্মশান।
সর্বস্বান্ত চোখে পড়ে
বারবার হাতের শৃঙ্খল—
পলাতক প্রাণের সম্বল।

বিড়ম্বিত জীবনে আবার
কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে।
পালাবার নেই কোন খিড়কির দুয়ার।
সম্মুখে প্রতীক্ষমাণ সবুজ প্রান্তরে
শায়িত বল্লম ;
পায়ে পায়ে রুদ্ধগতি বিদ্যুৎ কদম,
ঘুম ভাঙে সম্মিলিত মুঠি ;
অগ্নিবর্ণ চোখের ভ্রূকুটি

মুহূর্তে হারায় দম্ভ,
দর্প তার হয় কুটি কুটি।

গঙ্গার জোয়ারে এসে লাগে
ভল্গার তীরের স্পর্শ
চোখে নব সূর্যোদয় জাগে ;
মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব ;
দিগন্তে দিগন্তে দেখি
বিস্ফারিত আসন্ন বিপ্লব।

এখানে বিচিত্র স্রোত
মুক্তির একাগ্র লক্ষ্যে আসে ;
আজকের তুরঙ্গ ইতিহাসে
দেশপ্রেম বল্গা ধরে।
পদক্ষেপ কেবলি চঞ্চল।
গ্রামে গঞ্জে শহরে বাজারে
দুর্জয় সংকল্প নেয় হাজারে হাজারে।
মৃত্যুকীর্ণ পথে হই জড়ো ;
নতুন জন্মের ডঙ্কা বাজে,
বেদনায় পৃথ্বি থরো থরো।

এদেশ আমার গর্ব
এ-মাটি আমার চোখে সোনা।
আমি করি তারি জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা॥

অ গ্নি কো ণ

সিঙ্গাপুরের যে তিনজন শহীদ
বৃটিশের ফাঁসিকাঠে আন্তর্জাতিক
গাইতে গাইতে প্রাণ দিয়েছেন

অগ্নিকোণ

অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি
খুন হয়ে যায় শাদা শাদা ফেনা
ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের
ক্ষুরধার তলোয়ারে।

বনেজঙ্গলে ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা।
কাঁধের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
ধনুকের মত বাঁকা পিঠগুলো
টান ক'রে ঘুরে দাঁড়ায়
পেরাকে পেনাঙে টিনের খনিতে
রবারের বনে
মসলার দ্বীপে
সোনাফলা ইরাবতীর দুধারে
উপত্যকায়
বদ্বীপে নীলকান্ত মণির
ঝিকিমিকি দেশে
শ্যামে, কম্বোজে
আনামী পাহাড়ে
মেকং নদীর বানডাকা জলে
ঘুম-ভেঙে-ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ।
রক্তের পাঁকে শত্রুকে পুঁতে
অন্ধকারের বুকে হাঁটু দিয়ে দুহাতে উপড়ে আনে
দুঃশাসনের ভিৎ।
মেঘে মেঘে তারা চকমকি ঠুকে
পথের নিশানা করে।
বজ্রের সুরে বেঁধে নেয় গলা। হাঁকে—

দিন এসে গেছে ভাই রে
রক্তের দামে রক্তের ধার
শুধবার।
দিন এসে গেছে ভাই রে
বিদেশীরাজের প্রাণভোমরাকে
নখে নখে টিপে মারবার।
দিন এসে গেছে
লাঙলের ফালে আগাছা উপড়ে
ফেলবার।
দিন আসে ভাই
কাস্তের মুখে নতুন ফসল
তুলবার।

কুঠিয়াল এক সাহেবের লাশে
শকুনিতে খায় ছিঁড়ে
লুণ্ঠনকারী পঁচিশটা যুগ
সাম্রাজ্যের নেশাতুর চোখ থেকে।
সে দৃশ্য দেখে—
দেশটাকে ভালবেসে
বাপদাদা যার প্রাণ দিল ফাঁসিকাঠে।
সে দৃশ্য দেখে—
সাদা ছেলে পেটে ধ'রে
যার কচি মেয়ে দিয়েছে গলায় দড়ি।
সে দৃশ্য দেখে—
যার বংশের বাতি
নিভে গেছে মারীমড়কের হাওয়া লেগে।
দেশের মাটিতে গড়াগড়ি যায়
সুলতান, রাজারাজড়া, উজির, শিখণ্ডীদের মাথা।
অত্যাচারীর পাড়ায় পাড়ায়
ত্রাহি ত্রাহি হাঁক ওঠে,

দলে দলে ত্রাণকর্তা বিমান
বাতাসে বারুদ ঠেসেঠুসে দিয়ে
কামানের মুখে মৃত্যুর ঝড় তোলে।
দুধের শিশুকে বুকেতে আঁকড়ে ধ'রে
মরে শত শত শহর-গাঁয়ের
অগ্নিকোণের মানুষ।
সে আগুনে পথ চেনে
বঞ্চিতদের দিগন্তজোড়া মিছিল।
রক্তে রক্তে ভিজে ওঠে লাল নিশান।
জঙ্গলে জলে পাহাড়ের কোলে
ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা।
মৃত্যুর ঝড় ঠেলে
অন্ধকারের গলা টিপে ধ'রে
রক্তের নদী উজিয়ে এগোয়
অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ।

ব্যারাকে ব্যারাকে বিদ্রোহী সেনা জাগে।
অস্ত্রাগারের দ্বার খুলে তারা
জনতার পাশে দাঁড়ায়।
লক্ষ লক্ষ পায়ের আওয়াজে
কেঁপে কেঁপে ওঠে মাটি।
ছত্রভঙ্গ দস্যুর দল
আগুনে আগুনে রাজ্য পুড়িয়ে দিয়ে
লেজ তুলে ছোটে জাহাজে আকাশযানে

লক্ষ লক্ষ হাতে
অন্ধকারকে দু-টুকরো ক'রে
অগ্নিকোণের মানুষ
সূর্যকে ছিঁড়ে আনে।

কোটি কণ্ঠের হুঙ্কারে লাগে
বজ্রের কানে তালা।

পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে॥

ঝড় আসছে

ঝড় আসছে, আকাশে মেঘ
চোখ পিট্‌পিট্‌ করে
অগ্নিকোণে দুহাতে কে
মশাল তুলে ধরে।

নদীতে বান, মাটিতে চিড়
শিকলে চাড় লাগে
লক্ষ পায়ের মিছিলে লাল
নিশান চলে আগে।

কিসের যেন ষড়যন্ত্র
বজ্রের ফিস্‌ফাসে
এগিয়ে গিয়ে হাওয়ায় কারা
বারুদ ঠেসে আসে।

দেশে দেশে বেইমানদের
বুক দুরদুর করে
দুয়োরে খিল, ঝাঁপ বন্ধ
বাজারে বন্দরে।

রাস্তা লোকে লোকারণ্য
পরোয়া আজ কাকে
যে দেবে প্রাণ, জীবন দেবে
বরমাল্য তাকে।

ঝড় আসছে, উঠে দাঁড়ায়
যে যেখানে আছে
ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর
যে মারে, সেই বাঁচে॥

একটি কবিতার জন্য

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়
সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেয় কারা
অনাগত এক দিনের ফতোয়া

মৃত্যুভয়কে ফাঁসীতে লট্‌কে দিয়ে
মিছিলে এগোয়
আকাশ বাতাস মুখরিত গানে
গর্জনে তার
নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে॥

মিছিলের মুখ

মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ
মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত ;
বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
আগুনের শিখার মত হাওয়ায় কম্পমান।
ময়দানে মিশে গেলেও
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়
ফস্‌ফরাসের মত জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ।

সভা ভেঙে গেল, ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল ভিড়
আর মাটির দিকে নামানো হাতের অরণ্যে
পায়ে পায়ে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই মুখ।
আজও দুবেলা পথে ঘুরি
ভিড় দেখলে দাঁড়াই
যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ।

কারো বাঁশীর মত নাক ভাল লাগে
কারো হরিণের মত চাহনি নেশা ধরায়
কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে জলে ওঠে না তাদের দৃপ্ত মুখ
ফস্‌ফরাসের মত।
আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন
মিছিলের একটি মুখ।

অন্য সব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়
কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা করে,
পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে
গায়ে সুগন্ধি ঢালে,
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কোষিত তরবারির মত
জেগে উঠে আমাকে জাগায়।

অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি
নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার,
জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধসিয়ে দিতে
ডাক দিই
যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা
দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
পারাপার করতে পারে॥

রাম রাম

কুকুরের মাংস কুকুরে খায় না।
ল্যাজ নিচু ক'রে
এ ওর দিকে তাকায়—
হুবহু এক,
যেন একজন আরেকজনের আয়না।
রাম রাম—
একটু তেল চাই কামানের চাকায়।

দিয়ে বহালতবিয়তে থাকলেন নিজাম।
এখন বজ্জাতগুলোকে টিট করা দরকার
চাই খুব জবরদস্ত এক
বন্দুক সরকার
মন্ত্রী হোন জল্লাদ
তারপর দেখা যাক
জমির আস্বাদ
ভোলে কি ভোলে না
অবাধ্য স্বাধীন ছোটলোক তেলেঙ্গানা॥

দীক্ষিতের গান

পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে, ভাই
আমিও ছিলাম একজন ; আজ প্রাণপণে তাই
ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লালঝাণ্ডা ওঠাই।

গা থেকে পাঁকের গলিত গন্ধ ধুয়ে মুছে দাও
স্বপ্নজড়িত জীবনের দ্বিধা চাবুকে ছোটাও
হাঁটু ছিঁড়ে যাক, দু-পায়ে রক্তকদম ফোটাও।

বিপদ-তাড়ানো আওয়াজে আজকে হাঁকো হৈ হৈ
ফাঁসিতে দিয়েছি জীবন, মরতে পিছপাও নই
গৃহকলহকে দূরে ঠেলে এসো একজোট হই।

চাপা বিদ্যুতে খেলে দুশমন বজ্রমুষল ;
অভুক্তদের মৃতদেহ ; চোরগুদামে ফসল—
ঝঞ্ঝায় মাথা উঁচু রাখি ; জানি যাত্রা কুশল।

হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার
শপথ আমার ; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার—
আত্মদানের ; স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার।

চোরাবালি টানে তাদের মুগ্ধ সমাধির দিকে
ফিরলো না যারা ; স্মরণে আমার তারা সব ফিকে।
শুধু ভুলি না কো ক্রান্তিকালের সাথীসঙ্গীকে।

প্রতিরোধ চাই ! অগ্নি ফলকে কাটে কুজ্ঝটি
মুক্তিনিশান হাতে নিয়ে ওঠে চল্লিশ কোটি
বীরবিক্রমে দ্বার আগলাবে লক্ষ করোটি।

পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে, ভাই
আমিও ছিলাম একজন ; আজ প্রাণপণে তাই
ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লালঝাণ্ডা ওঠাই ॥

ফুল ফুটুক

জয়মণি, স্থির হও

১

আজ যদি তুমি আমাকে দেখতে

মনে পড়ে যেত
পৃথিবীর সেই আদিম জন্মবৃত্তান্ত।
সীমাহীন শূন্যতায় ঘূর্ণ্যমান
এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড
কলকাতার ভিড়াক্রান্ত পথ ঠেলে
সামনে এগিয়ে চলেছে—

যেমন ক'রে আমরা দেখি

কোটি কোটি আলোকবর্ষ আগেকার
কোনো মৃত উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তুমি ভাবতে :

হয়ত
পুড়ে পুড়ে ছাই হবে সেই আত্মক্ষয়ী আগুন
হয়ত
দাউদাউ দাবাগ্নিশিখায়
জনারণ্যকে পুড়িয়ে মারবে।

২

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস অন্য—
নিভন্ত আগুনের চিতায়
জন্ম নেয়
মহিমান্বিত জীবন।

কাল সারাটা দিন আমাকে আলোড়িত করেছে
এক স্বপ্ন।

কোটালের বানের উত্তুঙ্গ তরঙ্গশিখরে উঠে
আমি দুহাতে ছুঁয়েছিলাম
আকাশ।

কে যেন ডেকেছে আমায়। কে?
—মিছিলের সেই মুখ।

দিগন্ত থেকে দিগন্ত জুড়ে বাড়িয়ে দিয়েছি হাত।

সে কি স্বপ্ন?
সে কি মায়া?
সে কি মতিভ্রম?

৩

তারপরই
বিদ্যুতের চকিত কশাঘাতে
দুর্নিবার
বেগান্ধ পতন।

সামনে ফেনিল তরঙ্গের গায়ে
নিজেকে সহস্র খণ্ডে ভেঙে
আমাকে বিদ্রূপ ক'রে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই ছলনাময়ী মুখ।

আমি তারস্বরে চেঁচিয়ে বললাম:

জয়মণি, স্থির হও!
হে কালবৈশাখী, শান্ত হও!

এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে,
দেখ,
আমি জটায় বাঁধছি
বেদনার আকাশগঙ্গা ॥

আমি আসছি

আকাশে তাকালাম
তোমার মুখ
চোখ বন্ধ করলাম
তোমার মুখ
বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ।

কচি কচি কণ্ঠে দিন আর রাত্রিকে টুকরো টুকরো ক'রে
কারা কাঁদছে
মৃত্যুর আতঙ্কে জীবনকে জড়িয়ে ধরে
কারা কাঁদছে
তাই
বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ।

আমি আসছি—
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি।
সঙীন উদ্যত করেছ কে? সরাও।
বাধার দেয়াল তুলেছ কে? ভাঙো।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আনছি
দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি ॥

রাস্তার গল্প

রাস্তার মোড়ে লালবাতি জেলে
শকুনেরা দেয় সন্ধ্যে
জোড়াবলদকে দেয়ালে লটকে
ঠোঁট চেটে বলে,
ভোট দে।

এ পাঁচ বছরে, বাপু রে
মহাশূন্যের গা ফুঁড়ে
করেছি তৈরি
স্বর্গের সিঁড়ি
উঠবি আকাশে পা ছুঁড়ে।

ফলারে দেশটা বিকিয়ে
পল্টনে নাম লিখিয়ে
শিঙে ফুঁকবার
স্বাধীনতাটুকু
কোনো মতে রাখ টিকিয়ে।

জমিতে থাকবে রক্ষী
পঙ্গপালেরা।
লক্ষ্মী,
ক্ষিধে পেলে ফুটপাথে চিত হয়ে
দে উড়িয়ে প্রাণপক্ষী।

যমদূত দেয় চৌকি।
সাবধান !
বাঁয়ে যাস কে ?
ভাল চাস যদি ভোট দে
ভুঁড়িদাসদের বাক্সে ॥

মা, তুমি কাঁদো

অন্ধকারের চোখ জ্বলে,
চোখে আগুন্।
শুকনো পাতায় সাঁই সাঁই করে
দম-আটকানো হাওয়া।

মা, তোমার কোলে মরা ছেলে
তুমি কাঁদো!
মর্মন্তুদ চিৎকারে, মাগো, আকাশ মাথায় করো!
বুকচাপা এই দুঃস্বপ্নকে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ভাঙো
এ জগদ্দল পাথর সরাও—
স্তব্ধতা ভাঙো!
পাষাণ গলাও,
কাঁদো।

বনেজঙ্গলে জলায় পাহাড়ে মাঠে জনপদে
হাটে বন্দরে
শুকনো ডাঙায়
ডুকরে ডুকরে কাঁদো।
নিথর নিস্তরঙ্গ দীঘিতে
নদীকল্লোলে
গাঁ-উজাড় দুর্ভিক্ষে মড়কে
অনাবৃষ্টিতে
ঝড়ে ঝঞ্ঝায় দিগ্‌দিগন্তে
পা ছড়িয়ে, তুমি কাঁদো।
করাতের দাঁতে লাঙলের ফালে
আকাশকে চিরে
বজ্র খসিয়ে আনো।

শোকের সাগর উথলিয়ে তুমি
কাঁদো।
মা, তোমার কোলে মরা ছেলে
তুমি কাঁদো।

শুকনো পাতায় সাঁই সাঁই করে
দম-আটকানো হাওয়া।
অন্ধকারের চোখ জ্বলে,
চোখে আগুন॥

বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে

কোটালের বানে মাথা উঁচু ক'রে
পাথুরে মাটিতে পা টিপে এগোয়
দুর্দমনীয় স্পর্ধা।
দুরন্ত ক্রোধ টান ক'রে বাঁধে
ধনুকের মুখে ছিলা।

বাঁয়ে চলো ভাই,
বাঁয়ে—
কালো রাত্রির বুক চিরে,
চলো
দুহাতে উপড়ে আনি
আমাদেরই লাল রক্তে রঙীন সকাল।

বাঁয়ে চলো ভাই,
বাঁয়ে—

পঙ্গপালকে তাড়িয়ে, মাঠের
আমরাই হবো সম্রাট।
দিগ্‌দিগন্ত পাকা ফসলের
সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো।

ফাঁসিকাঠ জেল গ্যাস গুলী ঠেলে
অন্ধকারকে দুপায়ে মাড়িয়ে
শকুনের চোখ গেলে দিই
চলো
সুখে শান্তিতে বাঁচি।

কোটালের বানে মাথা উঁচু ক'রে
পাথুরে মাটিতে পা টিপে দৃপ্ত মিছিলে এগোয়
দুর্দমনীয় স্পর্ধা।
দুরন্ত ক্রোধ টান ক'রে বাঁধে
ধনুকের মুখে ছিলা॥

সালেমনের মা

পাগল বাবরালির চোখের মত আকাশ।
তার নিচে পাঁচ ইষ্টিশান পেরনো মিছিলে
বার বার পিছিয়ে প'ড়ে
বাবরালির মেয়ে সালেমন
খুঁজছে তার মাকে।

এ কলকাতা শহরে
অলিগলির গোলকধাঁধায়
কোথায় লুকিয়ে তুমি,
সালেমনের মা ?
বাবরালির চোখের মত এলোমেলো
এ আকাশের নিচে কোথায়
বেঁধেছো ঘর তুমি, কোথায়
সালেমনের মা ?

মিছিলের গলায় গলা মিলিয়ে
পিচুটি-পড়া চোখের দুকোণ জলে ভিজিয়ে
তোমাকে ডাকছে শোনো,
সালেমনের মা—

এক আকালের মেয়ে তোমার
আরেক আকালের মুখে দাঁড়িয়ে
তোমাকেই সে খুঁজছে ॥

অগ্নিগর্ভ

যে লোকটা একটু আগে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল
এতক্ষণে সে বউয়ের গলা জড়িয়ে শুয়েছে।
উঠোন এখন খালি ;
পাড়ার লোক যে যার ঘরে গিয়ে
চোখের পাতার ছিটেবেড়ায়
চন্‌চনে ক্ষিধের দুরন্ত রাত্রিকে রুখছে।

গোটা দিন নয়,
দিনের আধখানা এখানে জীবন।

সন্ধ্যে হলে অন্ধকারে মোড়া অন্তহীন পাথারে
ডুব দাও।
চোখ বন্ধ করো, বন্ধ করো—
পেটের আগুনে মুখ দেখো না রাত্রির।

অনেক রাত্রে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়ে কারা ফেরে।
—না, এই অন্ধকার থাকার নয়।
পায়ের শব্দে রাত্রির স্তব্ধতা চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।
—না, এই মাথা নিচু করে মরা নয়।

এত রাত্রে কে যায় ?
—ভাইরে, আমি রাম ;
আমি রহিম ॥

একটি লড়াকু সংসার

নেভানো উনুনের ওপর পড়ন্ত আলোয়
যেন
ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে
কাল বিকেলে মাজা ভাতের হাঁড়ি।

ঘ্যান্‌ঘেনে ছোট্ট মেয়েটার
পায়ে আঠার মত লেগে
একবার ঘর একবার উঠোন করছে
এ-বাড়ির পোষা বেড়াল।

বাঁশের আল্‌নাটা এখনও দুলছে।
ছেঁড়া কামিজ মাথায় গলিয়ে
মানুষটা এইমাত্র গেছে
ছ-নম্বর গেটে।

হপ্তাবাজারে বিরাট সভা কাল—শান্তির।
ঢোল বাজছে ছ-নম্বর গেটে।

জেলা আপিস রিক্তহস্ত ;
কলকাতা থেকে খালি হাতে ফিরে
দাওয়ার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
রেশনের ভাঁজ-করা থলি।

এ-মাসের শেষাশেষি ;
ও-মাসের শেষ কিস্তিও মেলে নি।

মেজো নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে
সারাদিন লাইনে কয়লা কুড়িয়ে
একটু পরেই বুড়ী ফিরবে।

আজকের নতুন ফোস্কাগুলো আজকে সারাটা রাত
তাদের হাতে জলবে।

কোনো রকমে কোমর বেঁকিয়ে
খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছাগলটাকে খাওয়ায়
এ-বাড়ির আসন্নসম্ভবা বউ।

পেটে তার উপোসী ছেলেটা কিচ্ছু বলে না
—শুধু দিন গোণে॥

গাছে গাছে

গাছে গাছে আমের বোল
ঝল্‌সানো পাতা।
স্নিগ্ধ স্নাত গোধূলির মত
বিলম্বিত
আমাদের ভালবাসা।

পেছনে তাকাই—
গন্‌গনে আগুন।
কপালে জল্ জল্ করছে
ঘাম
—রাজটিকার মত।

আকাশে দীপ্যমান কে তুমি ?
নক্ষত্রখচিত স্বপ্ন।
ফুরফুরে হাওয়ায় কার ওড়না ?
অবগুণ্ঠনবতী পৃথিবীর।

প্রিয়তমা, তুমি কোথায় ?
প্রতিধ্বনির তরঙ্গে,
            চোখের তারায়।

তাহলে এসো,
            অন্ধকার উদ্ভিন্ন করি ;
                        আমাদের চোখের স্থির লক্ষ্যে
পৌঁছে যাক সকাল ॥

যেতেই হবে

কে যায় ?
আমরা।

আমরা গাঁয়ের
আমরা শহরের
হাড়কালি মানুষ।
চলেছি মিছিলে।

হাতে কী ?
নিশান।

কোথায় যাও ?
দমন রাজার
দরবারে।

থামো—
—না।

বাধা দিলেও
—না।
সঙীনে বিঁধলেও
—না।

রাস্তা দাও।
আমাদের যেতেই হবে
মিছিলে॥

আগুনের ফুল

ঝড় মাথায় নিয়ে আমরা আসছি।
মাঠের কাদা-লাগা ফাটা পায়ে
শানবাঁধানো পাথরে
আগুনের ফুল তুলে
আমরা আসছি।

আমাদের চোখে জল ছিল ;
এখন আগুন।
হাড়-বার-করা পাঁজরগুলো
এখন
বজ্র তৈরির কারখানা।

যাদের সঙীনে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুৎ
তারা সামনে থেকে সরে যাও।
আমাদের চওড়া চওড়া কাঁধের চাড়ে

দেয়াল ভেঙে পড়ছে—
সরে যাও।

গ্রাম খালি করে আমরা আসছি।
খালি হাতে ফিরব না॥

নতুন বছরে

সোনা আমার, মানিক আমার
বাছা রে,
কী পেলে তুই খুশী হবি,
কী নিবি
নতুন এই বছরে ?

আমাকে দিও খেতে
এক বাটি দুধ দিনে
মাটির দুটো খেল্‌না দিও কিনে

বরং
এক বাক্স রং
আকাশে দিও ঢেলে
এবং
বালাই মুছে মাটিতে দিও পেতে
অফুরন্ত স্বপ্ন দেখার
শান্তির পৃথিবী॥

লাল টুকটুকে দিন

তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ !
এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যাকে খুঁজে
বেলা গেল।
                ফিরে দেখি সে আগন্তুক
ঘর আলো ক'রে বসে আছে পিলসুজে।

দিনে দূরে ঠেলে দিনান্তে নিলে কাছে।
ঠা-ঠা রোদ্দুরে পাই নি কোথাও ছায়া,
নীল সমুদ্র পুড়ে গেছে সেই আঁচে
চোখ মুছি—
                তুমি স্বপ্ন ?
                        না, তুমি মায়া ?

আমাকে কঠিন বাহু দিয়ে বাঁধো তুমি—
গলুক
        বুকের
                অশ্রুজমাট শিলা।
দাও তুমি ভালোবাসাকে জন্মভূমি
ঘৃণার ধনুকে
                আমি টেনে বাঁধি
                        ছিলা।

সারাদিন গেল।
                কেন দিলে না কো দেখা—
ফুৎকারে দিক্‌পৃথিবী আঁধার ক'রে ?
বুঝি সেই রাগে
                ঝঞ্ঝায় একা একা
এখনও বজ্র আকাশকে ছেঁড়ে খোঁড়ে ?

দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের
ঘোড়ায় চাপায় জিন।
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন॥

সুন্দর

যখন তোমার আঁচল দম্‌কা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল

তখনও নয়

বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মত জ্বলছিল

তখনও নয়

কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে
তুমি যখন হাসলে

তখনও নয়

যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল

যখন তোমাকে আর দেখা গেল না –

তখনই

আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে ॥

বাসি মুখে

অসহ্য গরমে
একবার এপাশ একবার ওপাশ করছে
ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের ঘুট্‌ঘুটে রাত্তির।

বাল্‌ব-চুরি-করা রাস্তায়
জোনাকিদের চোখে
চম্‌কে চম্‌কে ওঠে কী এক ষড়যন্ত্র।

হঠাৎ হঠাৎ পুকুরে ঘাই দেয়
প্রকাণ্ড এক রুই।

এত রাত্তিরে জোলাদের ছোট বউটা
পাড়ে ল্যাম্পো রেখে আছ্‌ড়ায়
এক গাদা বিশ নম্বর সুতোর বাণ্ডিল।

নতুন বিয়ে করা ছেলেটার দেখা নেই—
সারাটা শীত শেষ রাত্তিরে উঠে
কল্‌সী কল্‌সী রস এনেছে,
সারাটা গ্রীষ্ম রাত গভীর হলে
গোপন আড্ডায় মাতালদের নেশাগ্রস্ত ক'রে
তবে সে ফিরবে।

অন্ধকারকে আছ্‌ড়াতে আছ্‌ড়াতে
ছোট্ট বউটা ভাবে—
তাহলে কালও উনুনে আঁচ পড়বে না ?

পারুল বোন

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার—
দেখি তো কে তোমার পায়
বেড়ি পরায় আবার ?

শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে
পারুল বোন আমার।

সোনার ধানের সিংহাসনে
কবে বসবে রাখাল
কবে সুখের বান ডাকবে
কবে হবে সকাল !

শিয়রে জেগে সাতটি ভাই
মৃত্যুকে আজ তাড়ায়
ফুটিয়ে ফুল লক্ষ আশার
জীবন হাত বাড়ায়।

শিকলে বাঁধে স্পর্ধা কার ?
পারুল, বোন আমার !

ককিয়ে-ওঠা যন্ত্রণা নীল
　　আগুনে যাক পুড়ে
বাতাসে সব দুঃস্বপ্ন
　　আকাশে যাক উড়ে—

শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে
পারুল বোন আমার ॥

এক অসহ্য রাত্রি

কী এক গভীর চিন্তায়
　　　কপাল কুঁচকে আছে
　　　　　চড়িয়ালের রাস্তা।

একবার এ-আলোর নিচে, একবার ও-আলোর নিচে
গাছের পাতায়
বার বার নড়েচড়ে বসছে
ধৈর্যচ্যুত অন্ধকার।

কশাইখানায় বন্ধ ঝাঁপ পাহারা দিচ্ছে
চর্বিতে ফেটে পড়া
একালষেঁড়ে হিংসুটে কুকুর।

　　　পেট্রোল পাম্পের গায়ে-গা-দেওয়া খোলার বাড়িটা
　　　আজ সন্ধ্যে থেকেই নিশুতি
　　　দাওয়ার ওপর সারি সারি বিড়ির আগুনে
　　　জ্বলছে না
　　　রক্তহীন কাজলটানা ক্ষুধার্ত চোখ।

অষ্টপ্রহর হরিনাম-করা-পাখির খাঁচাটা
একা এককোণে ঢুলছে।

সাঁকোটার কাছেই
কাল রাত্রে যেখানে একটা লোক খুন হয়ে গেছে
সেখানে দিনকে-রাত-করতে-পারা এক
উর্দিপরা পুলিশ
প্রাণপণে লাঠিতে মুখ গুঁজে বৃথাই চাইছে
রাতটাকে দিন করতে।

রাস্তার দুপাশাড়ি বস্তি থেকে
মাঝে মাঝে ভেসে আসছে দম-ফাটা আওয়াজ—
চটের অদৃশ্য ফেঁসোগুলো
বুকের গহ্বরে দড়ি পাকিয়ে
বুঝি হৃৎপিণ্ডগুলোকে বিষম জোরে টানছে॥

ছিটমহল

এক কবি।
তিনি পরতেন চুপি চুপি
লম্বা মেঘের পাজামা।
ঝড়ঝঞ্ঝার ফুঁ দিয়ে
যখন ইচ্ছে বত্রে
বাজাতেন তিনি
প্রকাণ্ড এক দামামা—

পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসতেন খুবই
মাটিতেই তাঁর
ছিল পা।

এক কবি।
ছিল আকাশটা তাঁর টুপি
সমুদ্রে তিনি শুতেন।
আলো রাখতেন লুকিয়ে
অন্ধকারের গর্তে।
ভবিষ্যৎকে
হাত বাড়িয়েই ছুঁতেন—

পৃথিবীও তাঁকে ভালোবেসেছিল খুবই—
মাটি দিলো তাঁকে
শিরোপা।

ইট কাঠ ক্ষিধে তেষ্টার গায়ে গা দিয়ে
মাটির পায়ে পা বাধিয়ে
কবিদের আছে
আলাদা একটা জগৎ—

স্বপ্ন সেখানে মাথা উঁচু করে
বেড়ায়।

মাঝখানে শুধু দুদিক বাঁচিয়ে
বসে থাকে কাঁটাতারের বেড়ায়
বাঁধা গৎ॥

দিয়েন বিয়েন ফুঃ

পুব দখিনে
আগুন-বোনা
সাত সাগরের ঝি!

আকাশ কেন
নীলবর্ণ?
সাপে কাটল কি?

সাপে কাটুক, খোপে কাটুক
আছে আমার
মন্ত্র পড়া ফুঁ—

যা রে
সাপের বিষ
দিয়েন বিয়েন
ফুঃ॥

পারাপার

আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।

দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জান্‌লা।

ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা॥

ডাইনে বাঁয়ে

বাপুহে, বড়ই খারাপ পড়েছে
দিনকাল।
কিছু বুঝছিনে হালচাল—
দৈনিক গলা কাটা পড়ে যায়
মাথা না পেতেও লাইনে।
বাঁয়ে আনতে না আনতে দেখছি
একেবারে সাফ ডাইনে।

হা পোড়া-কপাল!
ময়দানে গিয়ে
যদিবা কখনও তুলি ঢেউ,
হাতে দড়ি নিয়ে

পেছনে অমনি
লাগে ফেউ।

মোড়ে বসে এক ডাইনী
দল বেঁধে গেলে
থপ্ ক'রে ধরে—
'বাঁদিকে যাওয়া বে-আইনী!'

ধরা পড়ে গিয়ে
মহাভারতের
সপ্তরথীর ব্যূহে
বলি অগত্যা—
'প্রভু হে,

তোমার কৃপায় যদি একবার গজায়
দুটো দিকে দুটো পাখনা,
হাততালি দিয়ে
উড়ে যাবো
কেয়া মজায়
খুলে আকাশের রং-চটা নীল
ঢাকনা॥'

পুপে

মেয়ে আমার পুপে
যখনই যায় ছাতে
ছোট্ট ছোট্ট হাতে
প্রকাণ্ড নীল আকাশটা চায়
না দিলে নেয় লুফে।

পুপে যখন বড় হবে
তখন অন্য বায়না
মেলায় কিনে দিতে হবে
চিরুনি আর আয়না।

আমি যতই হই না কেন
আল্‌সে,
বাপের ঘরে থাকবে না কো
জানি চিরকাল সে।
সিঁদুর পরতে গিয়ে যখন
খুলবে রুপোর কৌটো;
হঠাৎ মনে হতেও পারে
কী যেন তার ছিল।

হয়ত তখন খুলে দেখবে মুঠো—
প্রকাণ্ড নীল সেই আকাশটা
কখন গেছে উপে।
যখন অনেক বড় হবে
আমার মেয়ে পুপে॥

গাজনের গান

মেঘে মেঘে ঢ্যাম্ কুড়্কুড়্
বাজনা বাজে গাজনের।
বাবুই, তোমার বাসা উড়ুক
নতুন দিনের বাতাসে।
ঘর ছেড়ে আজ বাইরে এসো,
ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
ফুঁ দাও।
হাওয়ার মুখে ওড়াও ছেঁড়া
ইতিহাসের পাতা।

ঝড় উঠেছে
বাইরে এসো
ঝড়ের সঙ্গে
ফুঁ দাও।

আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে
কে কাঁদে কে?
চোখ মুছিয়ে দুচোখে তার
আগুন দাও জ্বেলে।
এবার বাসাবদল নতুন
ইতিহাসের ডালে—
মেঘে মেঘে বেজে উঠুক
ঢ্যাম্ কুড়্কুড়্ বাজনা;
কড় কড়িয়ে ডাকুক বাজ। তারপর—

মাঠে মাঠে জল ছিটিয়ে
বৃষ্টি পড়ুক মন্ত্র:
শান্তি শান্তি, শান্তি॥

কমরেড স্তালিন

কমরেড স্তালিন, তুমি
সুখে নিদ্রা যাও।
রাত শেষ হয়ে এল ;
দাও
এবার আমরা রাত জাগি।

গোলায় ফসল তুলে,
মাঠে বুনে ধান—
আমাদের হাতে তুমি দিয়ে গেলে
এ পৃথিবী,
তোমার নিশান।

আমাদের চোখ থেকে
মুছে নিলে ভয়,
যেদিকে তাকাই
দেখি
স্পন্দমান তোমার হৃদয়।
এ পৃথিবী তোমার হৃদয়।

মরুতে ফুটিয়ে ফুল,
নদীতে মিলিয়ে নদী
আমাদের হাতে তুমি রেখে গেলে
নতুন জীবন।

আমরা নিলাম তার ভার।
যদি মদমত্ত কেউ
বাড়ায় মৃত্যুর থাবা
ক্ষমা নেই তার।

স্তালিন জীবন হোক।   আজ থেকে
মৃত্যুহীন জীবনের
নাম হোক
        কমরেড স্তালিন ॥

শুধু ভাঙা নয়

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
চাষের জন্যে যে জমিটা পেলে ভাল হয়
সে তো ঠিক
বালি-চিক-চিক
        ভাঙা নয়।

দেখ দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই—

হামাগুড়ি দেয়,
        ব্যথা পেলে কাঁদে
                প'ড়ে গেলে ঠেলে ওঠে ফের,
ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে বাঁধে
সাধ আহ্লাদ আমাদের

হাত ছেড়ে দিলে দেয়ালটা ধ'রে
        করে হাঁটি-হাঁটি পা পা।
                ভুলে যেন তাকে
                        দিও না কো মাটি চাপা।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।

এখনও আকাশ সূর্যের রঙে
রাঙা নয়।

শিয়রে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে
গলিতনখ এ রাত্রি।
তবু যদি দুটি একটি করেও পাঁপড়ি
খুলে যায়,
কাছে থেকো—
পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে
সেটুকুও হয় থেঁতো।
ক্রমাগত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে
যারা হয়ে গেছে অন্ধ
তাদের নাকের কাছে ধ'রে দিও
ফুলের একটু গন্ধ।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।

মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না—
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।

যার লাগে না কো মিষ্টি
মানুষের এই সৃষ্টি,
যে বলবে এই পৃথিবীতে আছে
এক রং
শুধু রক্তের—
যত থাক নামডাক তার
যত বড় দল থাকুক অন্ধভক্তের—
টেঁকে কি না টেঁকে
একবার ভালো কবিরাজ ডেকে
অচিরে দেখানো দরকার।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোয়।
আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
—একটুও যার ভাঙা নয়॥

কাণ্ড দেখ!

যখন আকাশে ছাই,
গলা ঝাড়ে কামানের মুখ,
সবুজে ও নীলে কাঁপে আতঙ্কের ছায়া

সিংহাসনে ব'সে চোখ রক্তবর্ণ ক'রে
নখে দেয় শাণ, দাঁতে দাঁত ঘষে
লোলচর্ম লোভ

যখন বিষের থলি গালে নিয়ে
ভীরু মেরুদণ্ডহীন ভয়
ফণা তোলে—

বেঁকে বসে ইন্দ্রধনু,
সাত রঙে আকাশ সাজায়,
সমুদ্র দোলায় ঢেউ, পাতা নেচে ওঠে গাছে

ঘোমটা সরিয়ে দেখে ভালোবাসা
জীবনের মুখ।

মানুষের কাণ্ড দেখ!
কুমিরের চোখ এতদিনে
সত্যিই কান্নায় ভেজে,
সেই খাল দিয়ে তাকে ফিরে যেতে হয়
একদিন ঢুকেছিল যে-পথে সুয়েজে ॥

মামা-ভাগ্নের গল্প

সেকালে রাজারা যে-বয়সে যেত বনে
—মামা চলেছেন রণে।
বাজে তূরী-ভেরী
দামামা।

মামা ডেকে কন, 'ভাগ্নে!
পেতে চাস যদি বখরা
তবে এ-যুদ্ধে অন্তত কিছু ভাগ নে।'

অকালপক্ক ছোকরা
স্পষ্টই বলে,
'না মামা।'

খাল যার, সেই বেআদবটাকে
ভয়ে তটস্থ করতে
মামা চলেছেন লড়তে।

জোরে জোরে বাজে তূরী-ভেরী
বাজে দামামা।

ভাগ্নের হাঁচি পড়তেই মামা
রণপায়ে খান হোঁচট।
মামাকে এখন সারা পথ
যেতে হবে শুয়ে শুয়ে যে।

কানে কানে বলে ভাগ্নে,
'যেতে চাও যাও স্বয়েজে।
ভাগ্নেকে শুধু ব'লে যাও—
মাটি থেকে তুলে তোমাকে যখন
সবাই বলবে 'মামি'
—কী ব'লে ডাকব আমি?'

সহজিয়া

ভাড়াটে বাড়িতে থাকে, নিতান্ত ছাঁ-পোষা বংশ,
নেই কানাকড়িরও মুরোদ;
গাড়ি নেই সে আবার কথা বলে!
জানে না অধিক হাঁটলে পায়ে হয় গোদ?

আগে তো নেহাত ছিল গোবেচারা;
যাই বলা হ'ত শুনত; কিন্তু সে অধুনা
যা হয়েছে কহতব্য নয়—
তর্ক করে পায়ে পা বাধিয়ে। পেয়েছি নমুনা—

হালে তার। পুনরপি পাবো ব'লে বোধ হয়।
(কী আশ্চর্য, মানুষও বদ্‌লায়?
সমাজ-টমাজ হলে কথা ছিল!)
অতএব সে না গেলে কে যাবে গোল্লায়?

আমার বিশ্বাস : এর মূলে আছে আর কেউ,
সেই ব'সে কলকাঠি নাড়ায়।

যার সঙ্গে ঘোরে ফেরে, শুনতে পাই
সে-লোকটার একেবারে চরিত্র খারাপ ;
তদুপরি মদ খায়।
এ যা বলে, তার পিঠে ওর বুড়ো-আঙুলের ছাপ।

যেটুকু বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, আড়ালে তা বলা চলে ;
বাইরে বলার
অনেক বিপদ ; চাই চোথাপত্র।
তাছাড়া ব'সে তো ঘাস কাটে না ডলার ?

তাহলেই বুঝে নাও ; যারা বড় গলা ক'রে বলে :
'সহজিয়া ! সহজিয়া !'
—কার সঙ্গে কার যোগ !

তুমি ময়না, দাঁড়ে ব'সে করো শুধু জী-হাঁ, শুধু জী-হাঁ॥

আমরা যাবো

জলের কলে টিপ্ টিপ্
টিপ্ টিপ্।

এখুনি
বাসন-ধোয়া জলে
নিজের মুখ দেখবে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার আরও একটি সকাল।

ততক্ষণ শানবাঁধানো অন্ধকার
দেয়ালে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরুক
আর আমরা জলের কলে শুনি—
চোখ বড়ো-বড়ো করা আকাশের নিচে
পাথরের নুড়িতে নুড়িতে লাফিয়ে-পড়া
এক দিগ্‌ভ্রান্ত দামাল নদীর
কলতান।

তারপর সারাটা দিনমান।
মানুষ পায়ে চাকা বেঁধে চলুক।
যেখানে বন্দে মাতরম্ ব'লে মানুষ জীবন দিয়েছিল
কাটা হাত নিয়ে সেখানে হেঁটে যাক
কাঠের পা।

জলের কলে টিপ্ টিপ্
টিপ্ টিপ্

আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।

নদী বলেছিল যাবে
সমুদ্রে।
আমরা বলেছিলাম যাবো
সমুদ্রে।

আমরা যাবো ॥

দাঁড়ানো

'ওরে ও, হাভাতে বোকাটা,
গলা বাড়াস্নে আওয়াজে ;
হবি একেবারে ভোঁ-কাটা
প্যাঁচ খেলছেন রাজা যে।

পাঁচ বচ্ছর পর পর
রাজা হাঁকে ভবিতব্য—
ছিলি বুনো, হলি বর্বর,
দাঁড়া বাপু, হবি সভ্য।'

শুনে বুড়ী বলে, 'খুলে বল্
শেষে একেবারে ডুব্‌ব ?
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলা জল
হাড়েও গজালো দুব্বো।'

'ভয় নেই, উনি স্বয়ং
এক্ষেত্রে চান দাঁড়াতে
ওঁর হয়ে তুই বরং
ব'লে ট'লে রাখ পাড়াতে।'

লাগ্‌ লাগ্‌ ক'রে লেগে যায়
এর ঢাল ওর তরোয়াল
ভোট-কুড়ুনিরা কেড়ে নেয়
ঘুঁটেকুড়ুনির দেওয়াল ॥

এক যে ছিল

এক যে ছিল রাজা—
রাজত্বটা মস্ত
উঠতে বললে উঠত লোকে
বসতে বললে বসত।

একদিন সেই রাজার
রাজ্য গেল উল্টে
শূলে চড়ার আগেই রাজা
গেলেন পটল তুলতে।

রাজত্বটা কে চালাবে ?
গণক দেখেন কুষ্ঠি।
রাজা হয়ে উজির করেন
সবার মনস্তুষ্টি।

সিংহাসনে চোখ পড়তেই
ওঠে সবাই আঁতকে
রাজা না থাক, কিন্তু রাজার
গোঁফ রয়েছে আট্‌কে।

ভিড়ের মধ্যে কেউ খুলছে
পুঁথি বা কেউ পঞ্জী
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে রাজার
ভাইপো এবং বোনঝি ॥

সন্ধ্যামণি

সময়ের গলায়
এখনও আড় হয়ে আছে ঘড়ির কাঁটা।
ও বেড়াল, তোমার পায়ে পড়ি
খুলে দাও না।
এত সব শুনে টুনেও—
তেমনি গোঁজ হয়ে বসে থাকল বেড়ালটা।

হাতের কব্জিতে কালো কার বেঁধে
আমার চেয়েও ঢ্যাঙা
এক চোয়াড়ে অন্ধকার কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে।
সামনে কী আছে
কিছু ঠাহর করা যায় না।

আমার স্বপ্নগুলো
আছে—
কিন্তু আড়ালে।
করাতের দাঁতে দাঁতে ঘিষ্‌ঘিষ্‌ শব্দ—
খুব মিহি ক'রে কাটছে।
তারপর চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্ক
কত কী।

জোয়ানমদ্দ অন্ধকার
তার কাঁধটা সরালেই দেখতে পাবো
সবুজ মাঠ, মাঠে সোনার ধান—
এক জায়গায় ব'সে
আমরা হাপুস-হুপুস ক'রে খাচ্ছি।

শিকড়ে টান লাগছে
লাগুক—
শিকড়গুলো শক্ত ;
শুকনো পাতাগুলো ঝরে পড়ছে
পড়ুক—
অন্ধকার শব্দ ক'রে যাবে।

ততক্ষণ
আমিই বা বসে থাকি কেন ?
উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তুলবার
এই তো সময় ॥

ড্যাং ড্যাং ক'রে

এক পায়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে
জটাধারী একটি গাছ
        ঝুঁকে প'ড়ে
                যত দেখে, তত অবাক হয়—

ট্যাঁকে বাচ্চা নিয়ে
এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাসন মাজে
রাত্তিরে গাছতলায় মাদুর বিছিয়ে শোয়
যে মেয়েকে স্বামী নেয় না
যমেরও অরুচি—

ছি ছি !
আবার তার ছেলে হবে !

জলের কলে
সেই লজ্জাকে ঢাকতে
হাঁটি-হাঁটি পায়ে পায়ে
মার হাতে ছেঁড়া শাড়িটা এগিয়ে দেয়
লজ্জাকে মাথার মণি করা ছোট্ট একটি জীবন—
ক'দিন আগেও
শানের ওপর যে হামা দিত !

তার মানে—

তাহলে
        পৃথিবীতে
                আরও দুটো চোখ

আরও একটা মাথা উঁচু ক'রে
দুপাশে পাখির ডানার মত দুটো হাত
দোলাতে দোলাতে
মাটিতে ড্যাং ড্যাং ক'রে হেঁটে যাবে।

এক পায়ে
আজীবন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা
জটাধারী ঊর্ধ্ববাহু গাছটা
ঝুঁকে প'ড়ে
যত দেখে, তত অবাক হয়॥

ফুল ফুটুক না ফুটুক

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে—

মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে—
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো ॥

লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে ॥

আরও একটা দিন

দুপায়ে রাস্তার কাদা ঘুঁটে ঘুঁটে
ধ'রে ধ'রে পার হয়ে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোটা
এই মাত্র চলে গেল
আরও একটা দিন।

মাথার ওপরে টিন
শব্দ ক'রে
মাঝে মাঝে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।
সজ্‌নে গাছে ডাল ধ'রে দোল খায়
এখনও বৃষ্টির
বড় বড় ফোঁটা।

জলায় এবার ভাল ধান হবে—

বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে
এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে
সারাটা উঠোন জুড়ে
অন্ধকার নাচাতে নাচাতে ॥

এখন ভাবনা

১

এখন একটু চোখে চোখে রাখো—
দিনগুলো ভারি দামালো ;
দেখো,
যেন আমাদের অসাবধানে
এই দামাল দিনগুলো
গড়াতে গড়াতে
        গড়াতে গড়াতে
                আগুনের মধ্যে না পড়ে।

আমার ভালোবাসাগুলোকে নিয়েই
আমার ভাবনা।
এখন সেই বয়েস, যখন
দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট—
শুধু কাছেরটাই ঝাপ্‌সা দেখায়।

এখন সেই বয়েস, যখন
আচম্‌কা মাটিতে
প'ড়ে যেতে যেতে মনে হয়
হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকলে ভালো হত ॥

২

পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই—
সিংহের কালো কেশর ফুলিয়ে
গর্জমান সমুদ্র ;
দেয়ালে গুলীর দাগ,

ভাঙা স্লেট, ছেঁড়া জুতোয়
ছত্রাকার রাস্তা,
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত

মুক্তির বহুবর্ণ বাসনার নিচে
যৌবনকে পণ ধরেছিল জীবন।

ঠিক তেমনি দূরে,
কত দূরে ঠিক জানি না,
আজও দেখতে পাচ্ছি—
হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে।
গান গেয়ে
আমাকে বলছে দাঁড়াতে।

গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে
তার বলিষ্ঠ হাত দুটো আমি দেখতে পাচ্ছি—
আমি শেষ বারের মত
মাটিতে প'ড়ে যাবার আগে
আমার ভালোবাসাগুলোকে
নিরাপদে তার হাতে
পৌঁছে দিতে চাই ॥

যত দূরেই যাই

বন্ধু অশোক ঘোষ-কে

রচনাকাল : ১৯৫৭—১৯৬০

যেতে যেতে

তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
এক নদীর সঙ্গে দেখা।

পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা
পরনে
উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের
নীল ঘাগরা।

সে নদীর দুদিকে দুটো মুখ।

এক মুখে সে আমাকে আসছি ব'লে
দাঁড় করিয়ে রেখে
অন্য মুখে
ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

আর
যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল
আমি অমনি ক'রে আসি
অমনি ক'রে যাই।

বুঝিয়ে দিল
আমি থেকেও নেই,
না থেকেও আছি।

আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল
সময়।
তারপর কানের কাছে
ফিসফিস ক'রে বলল—

দেখলে!
কাণ্ডটা দেখলে!
আমি কিন্তু কক্ষনো
তোমাকে ছেড়ে থাকি না।

তার কথা শুনে
হাতের মুঠোটা খুললাম।
কাল রাত্রের বাসি ফুলগুলো
সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।...

২

গল্পটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই ব'লে
বুড়োধাড়িদের একেবারেই
ভাল লাগল না।
আর তাছাড়া
গল্পটা বানানো।

পাছে তারা উঠে যায়
তাই তাড়াতাড়ি
ভয়ে ভয়ে আবার আরম্ভ করলাম:
'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে...

দেখি বনের মধ্যে
আলো-জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহর।
সেখানে খাঁ-খাঁ করছে বাড়ি;
আর সিঁড়িগুলো সব
যেন স্বর্গে উঠে গেছে।

তারই একটাতে
দেখি চুল এলো ক'রে বসে আছে
এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা।'…

লোকগুলোর চোখ চকচক ক'রে উঠল।

তাদের চোখে চোখ রেখে
আমি বলতে লাগলাম—

'তারপর সেই রাজকন্যা
আমার আঙুলে আঙুল জড়ালো।
আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম :

"তুমি আশা,
তুমি আমার জীবন।"

শুনে সে বলল :
"এতদিন তোমার জন্যেই
আমি হাঁ ক'রে বসে আছি।" '
বুড়োধাড়িরা আগ্রহে উঠে বসে
জিগ্যেস করল : 'তারপর ?'

ব্যাপারটা তাদের মাথায় যাতে ঢোকে
তার জন্যে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে
মিলিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম—

'তারপর ? কী বলব —
সেই রাক্ষুসিই আমাকে খেলো ॥'

পায়ে পায়ে

সারাক্ষণ
সে আমার পায়ে পায়ে
সারাক্ষণ
পায়ে পায়ে
ঘুরঘুর করে।

তাকে বলি : তোমাকে নিয়ে থাকার
সময় নেই
হে বিষাদ, তুমি যাও
এখন আমার সময় নেই
তুমি যাও।

গাছের গুঁড়িতে বুক-পিঠ এক ক'রে
যৌবনে পা দিয়ে রয়েছে
একটি উলঙ্গ মৃত্যু—
আমি এখুনি দেখে আসছি :

পৃথিবীতে গাঁক গাঁক ক'রে ফিরছে
যে দাঁত-খিঁচোনো ভয়,
আমি তার গায়ের চামড়াটা
খুলে নিতে চাই।

চেয়ে দেখো, হে বিষাদ—
একটু সুখের মুখ দেখবে ব'লে
আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে
চুল সাদা ক'রে আহম্মদের মা।

হে বিষাদ,
তুমি আমার হাতের কাছ থেকে সরে যাও
জল আর কাদায় ধান রুইতে হবে।
হে বিষাদ,
হাতের কাছ থেকে সরে যাও
আগাছাগুলো নিড়োতে হবে।

যায় না ;
বিষাদ তবু যায় না।
সারাক্ষণ আমার পায়ে পায়ে
সারাক্ষণ
পায়ে পায়ে
ঘুরঘুর করে।

আমি রাগে অন্ধ হই
আমার বেদনাগুলো তার দিকে
ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি।
বলি : শয়তান, তোকে যমে নিলে
আমি বাঁচি !

তারপর কখন
কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছি জানি না
চেয়ে দেখি
দূরে ব'সে সেই আমার বিষাদ
আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে
আমার অপূর্ণ বাসনাগুলোকে নিয়ে খেলছে।

হাসতে হাসতে আমি তাকে
দুরন্ত শিশুর মত
কোলে তুলে নিই ॥

দিনান্তে

পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে
যেন কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মত
রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে
নিজের ডেরায় ফিরে গেল

সূর্য।

তার অনেকক্ষণ পরে
সরজমিন তদন্তে
দিনকে রাত করতে
যেন পুলিশের
কালো গাড়িতে এল

সন্ধ্যা।

আলোটা জ্বালতেই
জানলা দিয়ে বাইরে
লাফিয়ে পড়ল

অন্ধকার।

পর্দাটা সরাতেই
ভয়চকিত হরিণীর মত
আমাকে জড়িয়ে ধরল

হাওয়া॥

পোড়া শহরে

তেলচিটে সবুজ ঘাস একসঙ্গে লাইনবন্দী হয়ে
ঘাড় উঁচু ক'রে দেখছে—

কেমন ক'রে এ পোড়া শহরে
বুকের আঁচল সরিয়ে দিয়ে
কী আগ্রহে শুয়ে আছে
আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল—
রং যার
ঠিক চাঁপাফুলের মত।

দাঁড়ানো মানুষগুলোকে বগলদাবা ক'রে
তুলে নিয়ে
বেলা দশটার ট্রাম
ঝুলতে ঝুলতে গেল।

কালো কালো মাথাগুলো অদৃশ্য পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে
যেন আত্মসমর্পণের এক ভঙ্গিতে
হাত উঁচু ক'রে আছে।
কালো কালো মাথাগুলো
চোখে ফুটছে।

বাইরে শাড়িতে ঢাকা
দুটো শুভ্র পা
আমাদের দূরবর্তী ভবিষ্যতের মত—
তার মুখচ্ছবি কেমন
কোনোদিনই জানব না।

হঠাৎ
আমার ইচ্ছে হল ছুটে পালিয়ে যেতে।

আমার ইচ্ছে হল যেতে—
যেখানে তার চোখের
উজ্জ্বল নীল মণির মত আকাশ।
যেখানে ঢেউ তুলে আমাকে ডেকে নেবে নদী।
যেখানে যাব
আর আসব না।

তারপর ট্রাম থেকে নেমে
ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলাম।
পালাতে পালাতে
পালাতে পালাতে
ইটকাঠের প্রকাণ্ড একটা হাঁ-মুখ
আমাকে ঢেকে নিল॥

পাথরের ফুল

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

এখন আর
আমি সেই দশাসই জোয়ান নই।

রোদ না, জল না, হাওয়া না—
এ শরীরে আর
কিছুই সয় না।

মনে রেখো
এখন আমি মা-র আদুরে ছেলে—
একটুতেই গলে যাবো।

যাবো বলে
সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছি—
উঠতে উঠতে সন্ধে হল।
রাস্তায়
আর কেন আমায় দাঁড় করাও?

অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর
গাড়ি এখন টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে।
মোড়ে
ফুলের দোকানে ভিড়।
লোকটা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল?

২

ঠিক যা ভেবেছিলাম
হুবহু মিলে গেল।
সেই ধূপ, সেই ধুনো, সেই মালা, সেই মিছিল—
রাত পোহালে
            সভা-টভাও হবে!
(একমাত্র ফুলের গলা-জড়ানো কাগজে লেখা
নামগুলো বাদে)
সমস্তই হুবহু মিলে গেল।

মনগুলো এখন নরম—
এবং এই হচ্ছে সময়।
হাত একটু বাড়াতে পারলেই
ঘাট-খরচাটা উঠে আসবে।

এক কোণে ছেঁড়া জামা পরে
শুকনো চোখে
দাঁতে দাঁত দিয়ে

ছেলেটা আমার
পুঁটুলি পাকিয়ে ব'সে।
বোকা ছেলে আমার,
ছি ছি, এই তুই বীরপুরুষ ?
শীতের তো সবে শুরু—
এখনই কি কাঁপলে আমাদের চলে ?

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

৩

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।

তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুল্‌কি—
যা দিয়ে কোনোদিন কারো মুখোশ হয় না।

ঠিক এমনটাই যে হবে,
আমি জানতাম।
ভালোবাসার ফেনাগুলো একদিন উথলে উঠবে
এ আমি জানতাম।
যে-বুকের
যে-আধারেই ভ'রে রাখি না কেন
ভালোবাসাগুলো আমার—
আমারই থাকবে।

রাতের পর রাত আমি জেগে থেকে দেখেছি
কতক্ষণে কিভাবে সকাল হয়;
আমার দিনমান গেছে
অন্ধকারের রহস্য ভেদ করতে।
আমি এক দিন, এক মুহূর্তের জন্যেও
থামি নি।
জীবন থেকে রস নিংড়ে নিয়ে
বুকের ঘটে ঘটে আমি ঢেলে রেখেছিলাম
আজ তা উথলে উঠল।

না।
আমি আর শুধু কথায় তুষ্ট নই;
যেখান থেকে সমস্ত কথা উঠে আসে
যেখানে যায়—
কথার সেই উৎসে,
নামের সেই পরিণামে,

জল-মাটি-হাওয়ায়
আমি নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাই।

কাঁধ বদল করো।
এবার
স্তূপাকার কাঠ আমাকে নিক।
আগুনের একটি রমণীয় ফুল্‌কি
আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যথা
ভুলিয়ে দিক॥

যেন না দেখি

যেখানে আকাশের ছানিপড়া চোখের নিচে
তিন মাথা এক ক'রে আছে
লাঠি হাতে
থুনথুনে অন্ধকার

সেখানে সারাটা রাত
সারাটা দিন
শুধু টুপ টাপ
টুপ টাপ
মাটিতে পাতা পড়ার শব্দ

যেখানে স্টিমারের খালসির মত
স্মৃতি
শুধু রশি ফেলে ফেলে
জীবনের জল মাপে

আমি জানি
শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া
একদিন আমাকেও সেইদিকে
ঠেলবে।
হে পৃথিবী, আমি যেন সেই
দিনের মুখ
না দেখি।

তার আগে
তুমি আমার দুটো চোখ
দুটো পায়ে
ঘুঙুরের মত বেঁধে দিও॥

লোকটা জানলই না

বাঁ দিকের বুক-পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়-হায়
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল।

অথচ
আর একটু নিচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ
তার হৃদয়

লোকটা জানলই না।

তার কড়িগাছে কড়ি হল
লক্ষ্মী এলেন
রণ-পায়ে।
দেয়াল দিল পাহারা
ছোটলোক হাওয়া
যেন ঢুকতে না পারে।

তারপর
একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন

লোকটা জানলই না॥

যত দূরেই যাই

আমি যত দূরেই যাই
            আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা-গাঁথা
এক নদীর নাম—

আমি যত দূরেই যাই।

আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
        লক্ষ্মীর পা

আমি যত দূরেই যাই॥

ফিরে ফিরে

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলেছিল : আসবেন
দেখব, আসবেন
আচ্ছা, আসবেন দেখব।

বলেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলেছিলাম : মা আমার,
খেলনা আনব—
মা আমার,
আজ ঠিক আনব।

বলেছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি॥

কে জাগে

সেই কোন্ সকালে
    এই শহর
তার প্রকাণ্ড মুঠোটা খুলে
দূরে দূরে
  দূরে দূরে
    আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছিল

  তারপর সন্ধ্যা এসে
খুঁটে খুঁটে তুলে
  এক জায়গায় আবার আমাদের
    মিলিয়ে দিয়ে গেল।

বাইরে
  আলোগুলোকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে
দরজা দেবার শব্দে
    এখুনি ঘর অন্ধকার করবে
এই শহর।

এখুনি
  রক্তে রক্তে শোনা যাবে
    জলদ্গম্ভীর মহাকালের হাঁক :
'কে জাগে ?'

ভালোবাসার গা থেকে
ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে
তারস্বরে সগর্বে বলে উঠব :
'আমরা ॥'

আরও গভীরে

মাথার ওপর গোল কালো পাথরটায়
শান দিচ্ছে নখ
বিদ্যুৎ
অন্ধ রাগে।

পিঁপড়েগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ে
ছুটে পালাচ্ছে গর্তে।

ঝড় এখুনি উঠবে।

মাঠ জুড়ে থমথম করছে ভয়
ঘাসের ডগাগুলো কাঁপছে
আর কোথায় যেন ঝটপট
ঝটপট করছে
দিগ্‌ভ্রান্ত পাখিদের ডানা।

ঝড় যদি আসে আসুক
চলে যেতে কতক্ষণ ?

আমরা যেখানে আছি
আকাশে মাথা তুলে
সেখানেই থাকব

মাটির
আরও গভীরে
শিকড়গুলো চালিয়ে দিয়ে॥

ঘোড়ার চাল

মারা অত সহজ নয়
একটি আছে
আরেকটির জোড়ে।

ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে।

তোমাদের রাজাগুলোকে সামলাও হে,
নইলে
এই কিস্তিতেই মাত যে!

ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে।

২

মরুভূমির কড়াইতে টগবগ
টগবগ করছে
ফুটন্ত তেল—

ভাগো!

রবারের বনে বনে ঝুলছে
দড়ির ফাঁস।

পালাও!

লোভের কাঁটা-মারা জুতোগুলো
পায়ে পায়ে বেধে
ছিঁড়ছে।

৩

চাল ফেরত নেই,
সারা পৃথিবীটাকে বাজি রেখে
আমাদের খেলা।

ওদের বল ওরা যেভাবেই সাজাক
আমরা আড়াই-ঘরের পাল্লায়
ওদের পাব।

ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে ॥

গণনা

আমাকে একটা ফুলের নাম বলো—

আমি বলে দেব
ওদের কপালে কী লেখা আছে।

রক্তের মত লাল
আগুনের মত উদ্‌গ্রীব
নিশানের মত অশান্ত

মুষ্টিবদ্ধ
যার পাঁপড়িতে ঢাকা
এক ভয়ঙ্কর সুন্দর ক্ষুধিত শপথ।

আমি দেখতে পাচ্ছি—

রাস্তায় সারিবদ্ধ লাঠির শরশয্যা,
দু-নলের অনলে দুমদাম
মুখাগ্নি ;
তারপর কাঁদুনে গ্যাসের মত
ধোঁয়ায় কালো গাড়ি
আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি—

হাতে হাতে ফিরছে একটা ফর্দ—
নিহতের
আহতের
নিখোঁজের।

দিনের আলোয়
মাটিতে থেবড়ে বসে
কারা যেন হেঁকে হেঁকে
সংখ্যাগুলো অবিকল মিলিয়ে মিলিয়ে
নিচ্ছে ॥

রাস্তার লোক

চোখে পড়তেই
হঠাৎ আঁতকে উঠেছিল লোকটা।

তারপর ভালো ক'রে তাকিয়ে বুঝল,
না,
সে যা ভয় করেছিল তা নয়—

রাস্তার খোঁদলটার মধ্যে জমে রয়েছে
ট্রামলাইনের
মরচে-ধোয়া জল।

লোকটা আঁতকে উঠেছিল
কেননা সে জানত :
এখানে,
হ্যাঁ, এখানেই—

প্রাণপণে চাইল সে ভুলতে।

তারপর মনে হল
মাথায় লাঠির বাড়ি খেয়ে পড়ে-যাওয়া
গাঁয়ের হাড়-জিরজিরে বুড়োর মত
রাস্তাটা
একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে—
এখন বলুক সে কী করবে!

লোকটা চমকে উঠে
চোখ
সরিয়ে নিল।

এবার সে মুখ উঁচু ক'রে হাঁটবে
যেন কিছুতেই
তার পায়ের নিচে
রাস্তাটা না দেখা যায়।

দূরে
পুরনো গির্জার কাঁধের ওপর দেখো
কী সুন্দর টলটলে নীল
পূজোর আকাশ

দিনের নিবন্ত আলোয়
ঝুঁকে পড়ে
চোখ কুঁচকে দেখছে

এখন
ঘড়িতে ক'টা বাজল !

অমনি লোকটার বুকের মধ্যে
ছাঁৎ ক'রে উঠল।
এখন,
হ্যাঁ, এখনই তো—

প্রাণপণে চাইল সে ভুলতে।

সামনে পা ফেলতে গিয়ে
লোকটা হঠাৎ
শিউরে পিছিয়ে এল।
ইস্, আরেকটু হলেই সে মাড়িয়ে দিয়েছিল
মায়ের কোল-ছেঁড়া
একটা ত্নধের বাচ্চাকে।

তারপর ভালো ক'রে তাকিয়ে বুঝল
আসলে তার মনেরই ভুল ;
আজ অন্তত—
এ রাস্তার কোথাও
কোনো লাশ
পড়ে নেই।

কিন্তু
ঠিক সেই সময়
লোকটা শুনতে পেল—

পেছন থেকে
একটা নিষ্ঠুর দজ্জাল স্মৃতি
তার নাম ধ'রে
চিৎকার ক'রে ডাকছে।

হাত দিয়ে কান দুটো বন্ধ ক'রে
লোকটা তাড়াতাড়ি
পাশের একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল।

তারপর যেতে যেতে
বন্ধ দু কানে সে শুনতে পেল
রাবণের চিতা
দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে ॥

কেন এল না

সারাটা দিন ছেলেটা নেচে নেচে বেড়িয়েছে।

রাস্তায় আলো জ্বলেছে অনেকক্ষণ
এখনও
বাবা কেন এল না, মা ?

ব'লে গেল
মাইনে নিয়ে সকাল-সকাল ফিরবে।
পুজোর যা কেনাকাটা
এইবেলা সেরে ফেলতে হবে।

ব'লে গেল।
সেই মানুষ এখনও এল না।

কড়ার গায়ে খুন্তিটা
আজ একটু বেশি রকম নড়ছে।
ফ্যান গালতে গিয়ে
পা-টা পুড়ে গেল।

জানলার দিকে মুখ ক'রে
ছেলেটা বই নিয়ে বসল মাদুরে
সামনে ইতিহাসের পাতা খোলা—

ঘড়িতে টিকটিক শব্দ।
কলে জল পড়ছে।
ও-বাড়ির পাঁচিলটা থেকে লাফিয়ে নামল
একটা গোঁফঅলা বেড়াল।

বাপের-আদরে-মাথা খাওয়া ছেলের মত
হিজিবিজি অক্ষরগুলো একগুঁয়ে
অবাধ্য—
যতক্ষণ পুজোর জামা কেনা না হচ্ছে
নড়বে না।

এখনও
বাবা কেন এল না, মা ?

রান্না কোন্‌কালে শেষ
গা ধোয়াও সারা
মা এখন বুনতে ব'সে
কেবলি ঘর ভুল করছে।

খুট ক'রে একটা শব্দ—
ছিটকিনি খোলার।
কে ?
মা, আমি খোকা।

গলির দরজায় ছেলেটা দাঁড়িয়ে।
এখন রেডিওয় খবর বলছে।
মানুষটা এখনও কেন এল না ?

একটু এগিয়ে দেখবে ব'লে
ছেলেটা রাস্তায় পা দিল।
মোড়ে ভিড় ;
একটা কালো গাড়ি ;
আর খুব বাজি ফুটছে।

কিসের পুজো আজ ?
ছেলেটা দেখে আসতে গেল।

তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের গন্ধে-ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে
বাবা এল।

ছেলে এল না ॥

বারুদের মত

আকাশ রক্তচক্ষু,
পশ্চিমের সব জানলাই
হাট ক'রে খোলা।

গরাদের এপারে দেখো—
কয়েদীর ডোরাকাটা পোশাকে
এক টুকরো রোদ
মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে
হাঁটু মুড়ে
যেন মগরেবের নমাজ পড়ছে।

ঘরের বাইরে
ঢেউতোলা টিনের নিচে
দায়মল-কাটা ছায়া
এখন মুরগিগুলোকে কুঁড়ো খাওয়াচ্ছে ;

একটু পরেই উঠে গিয়ে
ঘাট থেকে
অন্ধকার কাঁখে ক'রে আনবে।

তারপর বেড়ার গায়ে
জোনাকিরা দল পাকিয়ে
উড়োজাহাজের আলোর সংকেতের মত
সারা রাত
জ্বলবে আর নিববে।

তারপর শেষ রাত্রে
রাস্তায় ভারী বুটের শব্দে
গায়েবী টুপি প'রে
উঠোনে পা নামাবে ষড়যন্ত্র—
কানের কাছে মুখ এনে
ফিসফিস ক'রে বলবে :

'অন্ধকার
কালো বারুদের মত,
দেশলাইটা দাও তো॥'

বোকা

ওহে খোকা! ব'সে পড়ো, ব'সে—
এদিকে তো পেকে গেল দাড়ি
কেন আর করো এ বয়সে
এর ওর তার সঙ্গে আড়ি?

তার চেয়ে দেখে ডাইনে বাঁয়ে
পথে এসো। বদ্‌লিয়ে স্বভাব
চোখ বুঁজে হাত রেখে পায়ে
জোরসে বলো: ভাব ভাব ভাব!

এখনও নামের ঠিক আগে
চন্দ্রবিন্দু নেই, আজও আছো—
এই ঢের। বুকের চেরাগে
বাতি নিববে, বেশি যদি হাঁচো।

জলে আছে সুবিধের সাঁকো।
ঘাড়টা নুইয়ে হও কুঁজো—
কথাই রয়েছে: যাকে রাখো
সেই রাখে। ভালো ক'রে বুঝো।

অতএব বেছে ফেলো পোকা।
হাত তোলো। উঠে যাক তাঁবু।
মালা নাও, নাম করো, বোকা—
কুশাসনে ব'সে, হয়ে বাবু॥

রংরুট

হেরেছি ? তাতে কী ?
কথনও যায় না শীত
এক মাঘে।
          আছে
লড়াইতে হারজিত।

পা তুলে টেবিলে
স্পর্ধা নাচায় ছড়ি
          হাতের চেটোয়।

এসো নিচু হয়ে ভরি
শুকনো বারুদ
আশার নতুন খোলে।
বীরের হৃদয়
যেন লক্ষ্য না ভোলে।

অন্ধকারের পর্দা থাকুক
                    টানা।
সবুজ পাতায় ঢেকে দাও
আস্তানা।
মুখে এঁটে নাও মুখোশ ;
                    আস্তে কথা।
চুপ।
     যেন টের পায় না অবাধ্যতা।

পা তুলে টেবিলে
স্পর্ধা নাচায় ছড়ি
     হাতের চেটোয়।

ক'টা বাজে ?

দেখো ঘড়ি।

বাইরে

কিসের আওয়াজ ?

মিছিলে কারা ?

বাজাতে বাজাতে চলেছে

কাড়া-নাকাড়া।

চোখে চোখে চায়

যারা ছিল দলছুট।

নাম লেখো। ময়দানে যাবে রংরুট।

হেরেছি ? তাতে কী ?

কখনও যায় না শীত

এক মাঘে।

আছে

লড়াইতে হারজিত ॥

এখন যাব না

বাতাসের কান আছে দেখছি—
হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন,
না, আমি গেলাম না নয়
আমাকে নিল না।

আপনাকে বলেই বলছি—
দেখুন, ও যে-গাছের আঙুর
তাতে টক না হয়ে যায় না।
আর তা ছাড়া এও তো ঠিক
সব বেড়ালের ভাগ্যেই
শিকে ছেঁড়ে না।

আপনাকে এই বলে দিচ্ছি, দেখে নেবেন—
কারো বাপের সাধ্যি নেই
লাথি মেরে
আমাকে এই পৃথিবী থেকে হটায়।
আমি এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম।
যতক্ষণ বরাবরের মত
মানুষের কাজ স্বাস্থ্য খাদ্য শিক্ষা নিরাপত্তার
একটা ভাল ব্যবস্থা না হচ্ছে
ততক্ষণ
মৃত্যুর গলায় পা দিয়ে হলেও আমি বাঁচব।

তারপর জীবন যখন খুব করে সাধবে
তখন ভেবে দেখব
যাব কি যাব না॥

ছাপ

কেউ দেয় নি কো উলু
কেউ বাজায় নি শাঁখ,
কিছু মুখ কিছু ফুল
দিয়েছিল পিছুডাক।

পরনে ছিল না চেলি
গলায় দোলে নি হার ;
মাটিতে রঙীন আশা
পেতেছিল সংসার।

আকাশের নীল গায়ে
শপথের ইস্পাত ;
দরজায় পিঠ দিয়ে
বাইরে গভীর রাত।

সারা বাড়ি থমথমে
সিঁড়ি একদম চুপ ;
দেয়ালে নাচায় ধোঁয়া
জানলায় রাখা ধূপ।

মুঠো মুঠো তারা নিয়ে
কড়ি খেলছিল মেঘ ;
ভুলে গেছে বুঝি হাওয়া
ঝড়ঝঞ্ঝার বেগ !

হঠাৎ যে কোথা থেকে
ছুটে এসেছিল ঝড় ;

ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে
দুলে উঠেছিল ঘর।

দু জোড়া বন্ধ ঠোঁটে
থেমে গিয়েছিল গান ;
চোখে রেখেছিল হাত
টেবিলের বাতিদান।

জীবনের হ্রদে স্মৃতি
চোখ বুঁজে দিল ঝাঁপ ;
ভিজিয়ে সে জলছবি
তুলে নিল এই ছাপ ॥

আলো থেকে অন্ধকারে

এ শহরে

যেখানে গাছের নিচে
ঘাড় হেঁট ক'রে
চোখ রেখে একদৃষ্টে
কালো কালো খোয়া-ওঠা পিচে,
সংসারের ভাব দ্বন্দ্ব ভাল মন্দ ইত্যাকার
নানান বিষয়ে
ভাবনায় নিগূঢ় হয়ে
নখ খুঁটছে
মাথায় ঘোমটা দেওয়া আলো

সেখানে দাঁড়ালো
সারা অঙ্গে পাউডারের খড়ি মেখে
ভয় ভালবাসা লজ্জা
সমস্ত ঘুচিয়ে
দুই বুকে তীক্ষ্ণ দুটি বল্লম উঁচিয়ে
ক্ষণকাল

তারপর
রাস্তার অপেক্ষমাণ ভিড় থেকে
গেঁথে নিয়ে রাত্রের শিকার
ময়দানের দিকে গেল হেঁটে

সমস্ত সভ্যতা ভুলে
খালি পেটে
নখে দাঁতে জিভে দিয়ে ধার
দু পাশে দাঁড়িয়ে উঠে
যেখানে হিংস্র অন্ধকার
টান মেরে খুলে দেবে নরকের দ্বার ॥

পা রাখার জায়গা

পৃথিবীটা যেন রাস্তার খেঁকী কুকুরের মত
পোকার জ্বালায়
নিজের ল্যাজ কামড়ে ধরে
কেবলি পাক খাচ্ছে ;
আর একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা প'ড়ো বাড়িতে
তার বিকট আর্তনাদই হল
জীবন

এই রকমের একটা শক্ত খোলসে ঢাকা
তরল বিষয়ের ওপর
মনকে তা দিতে বসিয়ে
একজন
একটা চাবির গোছা
দু হাতে ঢালা-উপুড় করতে করতে
হেঁটে
রাস্তা পার হচ্ছিল

হঠাৎ ঘ্যাঁচ ক'রে শব্দ।
আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ফুটপাথে ওঠা।

কী কারণে বুক ধড়াস ধড়াস করছে,
কেনই বা গলা শুকিয়ে কাঠ,
এসব তলিয়ে ভাল ক'রে বুঝে নেবার জন্যে
রেলিঙে ঠেস দিয়ে একটু দাঁড়াতে হল।
এক কথায়,
মাতালের মত ভুরু উঁচিয়ে
চোখ গুগলি ক'রে তাকানো চারটে চাকা
আর একটু হলেই

তাকে একটা বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে
ফেলছিল।

ছোকরার আক্কেল দেখে এক বুড়ো
ছানি-কাটা চোখের চশমাটা তার মুখের গোড়ায়
দূরবীনের মত করে ধরে,
ডান হাতের লাঠিটা মাটি ছেড়ে ঈষৎ তুলে,
মুখ বুঁজে নাকের দুটো বড়ো ফুটো দিয়ে
আর হাতের লাঠিটা দিয়ে খুব জোরে
'হুঁঃ' আর 'ঠকাস'
এই দুটো শব্দ বার ক'রে
যেদিক দিয়ে উজিয়ে এসেছিল সেই দিকেই ফের
চলে গেল।

বিরক্ত হয়ে চাবির গোছাটা পকেটে রাখতে গিয়ে
নজরে পড়ল
গোটা রাস্তা তার দিকে ফিরে
তাকে আঙুল দিয়ে শনাক্ত করছে।
নিজেকে একটু একা পাবার জন্যে
তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে সে গা ঢাকা দিল।

একটু হেঁটে যাবার পর একটা চায়ের দোকান।
গরম কাপের ছ্যাঁকায়
মনটা ঠাণ্ডা হল।
সামনের ফুটপাথে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে
উবু হয়ে বসে লোহার কড়াইয়ের একটা উনুন
হাওয়ার মুখে খই ফুটিয়ে
কাঠকয়লার আগুনে ভুট্টাগুলোকে পোড়াচ্ছে।
মাটিতে চাপ-চাপ রক্তের মত ফুল ;
ভুট্টার রং মানুষের গায়ের মত।

খালি কাপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে
লোকটা হঠাৎ উঠে পড়ল।
তিন নয়া পয়সার মিঠে পানে
মুখটা মিষ্টি ক'রে
মোড়ের ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে
হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিল।

তারপর লক্ষহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে
পা ধরে যাওয়ায়
যেখানে এসে সে দাঁড়াল, সেখানে সামনেই একটা
শো-কেস।
ভেতরে খুব বাহারে সব জিনিস
আহ্‌হা! রেফ্রিজারেটার! বেশ রেডিওটা! ওহো,
তাহলে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস
এখন বেশ শস্তায় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে!
একটা ভাল শাড়ি আর মেয়ের একটা লাল ফ্রক
কেনা দরকার অনেক দিন থেকে বলছিল বটে।
ঘড়ি কিনব
সবুর করো, আরেকটু শস্তা হোক।
আচ্ছা, একটা ইলেকট্রিক ক্ষুরের দাম কত ?
এহে, দাম-লেখা কাগজটা পিছন ফিরে রয়েছে।

তারপর সে গালে হাত দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল
এখুনি কামাবার দরকার আছে কিনা।
কাঁচের গায়ে ছায়া পড়েছে,
আরও একটু কাছে সরে গেল।
জামা নয়, শাড়ি নয়, রেডিও নয়, ঘড়ি নয়—
কী আশ্চর্য—
কাঁচের গায়ে অবিকল সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে;
তার সামনে আস্ত একটা মানুষ

বুক টান ক'রে দাঁড়িয়ে।
দেখে সে যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল
পৃথিবীর
জীবনের
সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে
যে দুটো হাত—
কী আশ্চর্য, সে হাত দুটো
সমস্তক্ষণ তো তার পাশাপাশিই ছিল

তারপরই একটা ভর্তি বাসের হাতল ধরে
ছুটতে ছুটতে—
সেই লোকটির মালকোঁচা-মারা আস্তিন-গোটানো
বাজখাঁই গলা শোনা গেল :

হাতটা সরিয়ে নিন না, মশাই!
ও দাদা, একটু এগিয়ে যান—
দয়া ক'রে,
স্যার, একটু পা রাখার জায়গা॥

মেজাজ

থলির ভেতর হাত ঢেকে
শাশুড়ি বিড়বিড় ক'রে মালা জপছেন ;
বউ
গটগট গটগট ক'রে হেঁটে গেল।

আওয়াজটা বেয়াড়া ; রোজকার আটপৌরে নয়।
যেন বাড়িতে ফেরিঅলা ডেকে
শখ ক'রে নতুন কেনা হয়েছে।

সুতরাং
মালাটা থেমে গেল ; এবং
চোখ দুটো বিষ হয়ে
ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে যেদিকে বউ যাচ্ছিল
সেইদিকে ঢলে পড়ল।
নিচের চোয়ালটা সামনে ঠেলে
দাঁতে দাঁত লাগল।

বিলক্ষণ রাগ দেখিয়ে
পরমুহূর্তেই শাশুড়ির দাঁত চোখ ঘাড় চোয়াল
যে যার জায়গায় ফিরে এল।
তারপর সারা বাড়িটাকে আঁচ্ড়ে আঁচ্ড়ে
কলতলায়
ঝমর ঝম খনর খন ক্যাঁচ ঘ্যাঁষঘিঁষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর
শব্দ উঠল।
বাসনগুলো কোনোদিন তো এত ঝাঁঝ দেখায় না—
বড় তেল হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে মালাটা দাঁড়িয়ে পড়ল।
নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়—
মালাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে
আবার চলতে লাগল।

নাকে অস্ফুট শব্দ ক'রে
থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল হঠাৎ
মালাটার গলা টিপে ধরল।
মিন্‌সের আক্কেলও বলিহারি!
কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুনে
        পায়ে খুরঅলা ধিঙ্গী মেয়ে ধরে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।
কেন? বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিল না?
বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—
হ্যাঁ, দিয়েছিল!
গলায় রস্থড়ি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল না?

এবার মালাটাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দেওয়া হল।
শাশুড়ির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল
থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এই সময়ে
কী যেন তিনি লুকোচ্ছিলেন।
একটা জিনিস—
ক'মাস আগে বউমা
মরবার জন্যে বিষ খেয়েছিল।
ভাশুরপো ডাক্তার না হলে
ও-বউ এ-বংশের গালে ঠিক চুনকালি মাখাত।
কেন? অসুখ ক'রে মরলে কী হয়?
ঢঙী আর বলেছে কাকে!

হাতে একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে
কালো বউ
গটগট গটগট ক'রে সামনে দিয়ে চলে গেল।

নাঃ, আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।
'বউমা—'
'বলুন।'
উহু, গলার স্বরটা ঠিক কাছা-গলায়-দেওয়ার মত নয়,
বড্ড হ্যাড়া।
হঠাৎ এই দেমাক এল কোত্থেকে ?
বাপের বাড়ির কেউ তো
ভাইফোঁটার পর আর এদিক মাড়ায় নি ?

বাড়িটা যেন ঝড়ের অপেক্ষায়
থমথম করছে।
ছোট ছেলে কলেজে ;
মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে
রাস্তায় মেয়ে দেখছে ;
ফরসা ফরসা মেয়ে
বউদির মত ভূশুণ্ডি কালো নয়।
বালতি ঠনঠনিয়ে
বউ যেন মা-কালীর মত রণরঙ্গিণী বেশে
কোমরে আঁচল জড়িয়ে
চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো।

শাশুড়ির কেমন যেন
হঠাৎ গা ছমছম করতে লাগল।
তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাতটা লুকিয়ে ফেলে
চোখ নামিয়ে বললেন : আচ্ছা থাক, এখন যাও।

বউ মাথা উঁচু ক'রে
গটগট গটগট ক'রে চলে গেল।

তারপর একা একা পা ছড়িয়ে বসে
মোটা চশমায় কাঁথা সেলাই করতে করতে
শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলেন
বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল
তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তারপর দরজা দেবার পর
রাত্রে
বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে
এই এই কথা কানে এল—

বউ বলছে : 'একটা সুখবর আছে।'
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা ; মা কান খাড়া করলেন।
বলছে : 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস ক'রে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে :
'কী নাম দেবো, জানো ?
আফ্রিকা।
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে॥'

ফলশ্রুতি

ফলের দোকানের সামনে
একসময়ে একটা বাঁধা হরিণ
গলার শেকলে টান পড়িয়ে
আড়চোখে এই শহরটাকে দেখত।

কোনোরকম আড়াল না নিয়ে,
কোথাও মাথা না গুঁজে—
সরাসরি আকাশের দিকে মুখ রেখে
দিব্যি চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে ডাকাবুকো রাস্তাটা।

সকাল হলেই
অলিগলি আর গাড়িবাড়ির আড়াল থেকে
কলকল ক'রে বেরিয়ে পড়ত মানুষ ;
তারা সামনে দিয়ে হনহনিয়ে যেত—
নিশ্চয় শিকারে।

বাসগুলো মোড় নিত হুমহাম শব্দে ;
তাদের বন্ধ খাঁচায় গর্‌র্ গর্‌র্ করত
ছোট ছোট বাঘের বাচ্চা,
ট্রামগুলো চলে গেলেই
তারের খেলা দেখাতে দেখাতে যেত
ছুরিতে শান দেবার একটানা হিসহিস শব্দ।
ফুটপাথের কোলের কাছে কোথাও
তৃষ্ণার জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত খাদে—
সামনে একটা থাম থাকায় দেখা যেত না।
মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ে আসত বিড়ির পাতা—
তাতে নানা মাপের জানলা-দরজা ফোটানো ;

তার ভেতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এ শহরকে দেখতে চাইত
দূরের এক ঘোমটা দেওয়া অরণ্য।

ফলের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে যেতে
লোকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ত—
বাঃ, কী সুন্দর ;
দেখো, দেখো ঠিক ছবির মতন !
হরিণটা মুখ বিষ ক'রে তাকাত।
সুন্দর ? মরণ আর কি ! তার দাঁত কড়মড় করত।
গলায়-শেকল-পরানো এই পোষা প্রভুভক্ত 'সুন্দর' শব্দটা
তার কিছুতেই আর বরদাস্ত হচ্ছিল না।
তার নাকের কাছে ঘোরাফেরা করছিল একটা আঁশটে সন্দেহ
শহর-বসানো এই অরণ্যের ভেতরে ভেতরে
আসলে খুব হিংস্র একটা ব্যাপার চলেছে।
মানুষ মানুষকে আর
মানুষকে মানুষ এখানে শিকার করছে,
কিন্তু রক্তের কোনো দাগ কোথাও রাখা হচ্ছে না।
'বাঃ, কী সুন্দর' বলে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতাকে চাপার চেষ্টা চলেছে।

বাঁধা হরিণের মনে হল
এর চেয়ে ঢের ভাল হত যদি তার প্রাণ-হাতে-করা সৌন্দর্য
মানুষ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে একাগ্র লক্ষ্যে ধনুকে টঙ্কার তুলে দেখত।
ঢের ভাল ছিল সেই অকপট স্থূল ব্যবহার
আগুনে চড়ে
যা রসনায় গিয়ে মানুষকে তবু যা-হোক হৃষ্টপুষ্ট করত।
সন্দেহটা চারিদিকে ক্রমশ পচতে থাকায়
হরিণের মুখে
পয়সা দিয়ে কেনা ঘাস আর রুচল না—
ঠোঁটের সামনে
যেমন তেমনি উপুড় হয়ে রইল।

শেষে একদিন
গলার শেকল খুলে রেখে
সেই হরিণকে
নড়বড়ে লোহার চাকাওয়ালা একটা গাড়ির ঘাড়ে চড়ে
ড্যাডাং-ড্যাং-ড্যাডাং-ড্যাং শব্দে
ঠ্যাং আকাশে আর চোখ কপালে তুলে
মহানন্দে এই শহরের বাইরে চলে যেতে দেখা গেল ॥

ছেই

ভাজা ইলিশের গন্ধে গলি ছেড়ে কিছুতেই নড়তে চায় না হাওয়া।
বুড়োরা গিয়েছে পার্কে ক্ষিধে করতে। পাঁচিলে বেড়াল দিচ্ছে ডন ;
কেননা আল্‌সেয় কাক। গালে হাত দিয়ে ভাবছে একা বোকা হাবা—
হায়, মেয়েটির আজ পাকা-দেখা ! পাত্র কিনল মেড-ইন-লণ্ডন।
হাতে আরশি। গোঁফ ছেঁটে বাবু দেন আপনাকে আপনি বাহাবা।
রাস্তায় রজনীগন্ধা হেঁকে যাচ্ছে। কেনো ফুল এক-আধ ডজন।
রোয়াকে বসেছে আড্ডা পুরোদমে। আজ কিন্তু চা শুধু, টা নেই।
আকাশটা দেখা যায় না ; দেখা গেলে মনে পড়ত কবিতা-টবিতা।
দমকল পুরুত গেল ঘণ্টা নেড়ে ! কিছু একটা ঘটেছে কাছেই।
এখনও পোকায় খায় নি ট্রাঙ্কে তোলা তার সেই সুন্দর ছবিটা।
ঠিকে-ঝি বাসন মেজে চলে গেছে। কলে জল পড়ছে তো পড়ছেই,
চোখের জলের মত। হায়, আজ পাকা-দেখা। অমনি পাকা গিন্নী পৃথিবীটা
শাড়ির আঁচলে হাওয়া নেড়ে দিয়ে বলে উঠল—ছেই-ছেই-ছেই।

দূর থেকে দেখো

আমি আমার ভাবনাগুলোকে
চামচে ক'রে নাড়তে থাকব—
অন্য কোনো টেবিল থেকে তুমি শুনো।

সামনে দাঁড় করানো থাকবে কাপ
আমার কোলের ওপর দুটো আঙুল
কুরুশকাঠির মত বুনবে
স্মৃতির জাল—
তুমি অন্য কোনো টেবিল থেকে দেখো।

তারপর
যখন জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে সময়
চেয়ারে শব্দ ক'রে আমি উঠে পড়ব
পেছনে একবারও না তাকিয়ে
আমি চলে যাব
যেখানে বাড়িগুলোর গায়ে
চাবুক মারছে বিদ্যুৎ
যেখানে গাছগুলোকে চুলের মুঠি ধরে
মাটিতে ফেলে দিতে চাইছে হাওয়া
যেখানে বন্ধ জানলায় নখ আঁচড়াচ্ছে
হিংস্র বৃষ্টি।

তুমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো॥

এই পথ

চোখে চোখ পড়তে

পুরনো বন্ধুত্ব
একটু হেসে
হাত নেড়ে চলে গেল।

কাঁচের গায়ে চোখ রেখে
পেছন ফিরে একবার চাইলেই
দূর থেকে দেখতে পেত—

ময়রার দোকানের
কান-বেঁধানো এক উটকো শালপাতা
একটা মধুর স্মৃতি ঠোঁটে ক'রে নিয়ে
ডানাভাঙা পাখির মত
একটু উড়তে চেষ্টা করেছিল।

তাকে জুতোর তলায় চেপে,
চারিদিকে তাকিয়ে,
ভাল ক'রে গাড়িঘোড়া দেখে
তারপর খুব সাবধানে
আমি রাস্তা পার হলাম।

২

বুড়োধাড়ি গাছ

যেন কোমরে ঘুনসি বেঁধে
দিগম্বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে

ভাঙা জং-ধরা লোহার বেড়াটার গায়ে
দড়ির আগুনে
নিভে-যাওয়া সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
হাসি পেল।

একদল লোক হরিবোল দিতে দিতে
খই ছড়িয়ে গেছে রাস্তায়
একদল কাক তাই
খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

৩

কলের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে

ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ।

মাথার ওপর একটানা দীর্ঘ তারে
ছড় টেনে
ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল
একটা মন্থর ট্রাম।

তারপর আবার ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে
ঝাঁঝরিতে।

৪

আমি আজও ভুলি নি
সামনে পেছনে সশস্ত্র পাহারা

আকাশ পত্রজালে ঢাকা
আমরা বন্দীর দল
পাথরে পা টিপে টিপে উঠছি।

হঠাৎ আমরা কথা বন্ধ করলাম
তারপর কান পেতে শুনতে লাগলাম
স্তব্ধ পাহাড়ে
ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
এক অদৃশ্য ঝর্নার শব্দ।

একটা ঘুড়ি কেটে এসে পড়তেই
রাস্তায় খুব হল্লা হল।
পুলিশের কালো গাড়ি এসে থামতে
কে একজন পেছন থেকে বলল—

মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে॥

মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ

আরে ! মুখুজ্যেমশাই যে ! নমস্কার, কী খবর ?
আর এই লেখা-টেখা সংসার-টংসার এই নিয়েই ব্যস্ত ।
তা বেশ । কিন্তু দেখো মুখুজ্যে,
আমার এই ডানদিকটাকে বাঁদিক
আর বাঁদিকটাকে ডানদিক ক'রে
আয়নায় এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া—
আমি ঠিক পছন্দ করি না ।
তার চেয়ে এসো, চেয়ারটা টেনে নিয়ে
জানলায় পা তুলে বসি ।
এককাপ চায়ে আর কতটা সময়ই বা যাবে ?

দেশলাই ? আছে ।
ফুঃ এখনও সেই চারমিনারেই রয়ে গেলে ।
তোমার কপালে আর ক'রে খাওয়া হল না দেখছি ।
বুঝলে মুখুজ্যে, জীবনে কিছুই কিছু নয়
যদি কৃতকার্য না হলে ।

২

আকাশে গুড়গুড় করছে মেঘ—
ঢালবে ।
কিন্তু খুব ভয়ের কিছু নেই ;
যুদ্ধ না হওয়ার দিকে ।
আমাদের মুঠোয় আকাশ ;
চাঁদ হাতে এসে যাবে ।

ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির,
অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই
পাল্লা ভারী হচ্ছে ।

ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালবাসা।
পৃথিবীর ঘর আলো ক'রে—
দেখো, আফ্রিকার কোলে
সাত রাজার ধন এক মানিক
স্বাধীনতা।
পাজীর পা-ঝাড়াদের আগে যারা কুর্নিশ করত
এখন তারা পিস্তল ভরছে।
শুধু ভাঙা শেকলগুলো এক জায়গায় জুটে
এই দিনকে রাত করবার কড়ারে
ডলারে ফলার পাকাবার
ষড়যন্ত্র আঁটছে।

পুরনো মানচিত্রে আর চলবে না হে,
ভূগোল নতুন ক'রে শিখতে হবে।
আর চেয়ে দেখো,
এক অমোঘ নিয়মের লাগাম-পরা
ঘটনার গতি
পাঁজির পাতায় রাজজ্যোতিষীদের
দৈনিক বেইজ্জত করছে।

ধনতন্ত্রের বাঁচবার একটাই পথ
আত্মহত্যা।
দড়ি আর কলসি মজুত
এখন শুধু জলে ঝাঁপ দিলেই হয়।

পৃথিবীকে নতুন ক'রে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনো,
ক্রুশ্চভের গলায়।

নির্বিবাদে নয়, বিনা গৃহযুদ্ধে
এ মাটিতে
সমাজতন্ত্র দখল নেবে।
হয়ত একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে
কিন্তু যখন হবে
তখন খাতা খুলে দেখে নিও
অক্ষরে অক্ষরে সব মিলে যাচ্ছে।

৩

দেখো মুখুজ্যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় করে
যখন অমন সুন্দর বাইরেটা
আমার এই আগোছালো ঘরে হারিয়ে যায়।

যখন দেখি ঠিক আমারই মত দেখতে
আমার দেশের কোনো ভাই
উলিঢুলি ছেঁড়া কাপড়ে
আমাকে কাঁদাতে পারবে না জেনেও
বলে বলে দুঃখের কথাগুলোতে ঘাঁটা পড়ায়—
আমার লজ্জা করে।

পাঞ্চেতের এক সাঁওতাল কুলি দেখতে দেখতে
ওস্তাদ ঝালাইমিস্ত্রি হয়েছিল—
এখন আবার তাকে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে পেটভাতায়
পরের জমিতে আদ্যিকালের লাঙল ঠেলতে হচ্ছে।
এক জায়গায় রুগী ডাক্তার অভাবে মরছে,
অন্য জায়গায় ডাক্তার রুগী অভাবে মরছে।
কেন হয়?
কেন হবে?

আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ—
ভাল কথা।
কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন—
খুব ভাল।
মশা মাছি সাপ বাঘ তাড়িয়ে
ইস্পাতের শহর বসেছে—
আমরা সত্যিই খুশী হচ্ছি।

কিন্তু মোটেই খুশী হচ্ছি না যখন দেখছি—
যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
আর যার ভাত আছে তার হাত নেই।

তবু যদি একটু পালিশ থাকত।
তা নয়,
মুচির দোকানের লাশে-চড়ানো জুতোর মত
মাথার ওপর ঝুলছে।

গদিতে ওঠবস করাচ্ছে
টাকার থলি।
বন্ধ মুখগুলো খুলে দিতে হবে
হাতে হাতে ঝনঝন ক'রে ফিরুক।
বুঝলে মুখুজ্যে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না
আড় হয়ে লাগতে হবে।

৪

যারা হটাবে
তারা এখনও তৈরি নয়।

মাথায় একরাশ বইয়ের পোকা
কিলবিল করছে ;
চোখ খুলে তাকাবার
মন খুলে বলবার
হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবার—
মুখুজ্যে, তোমার সাহস নেই।

আগুনের আঁচ নিভে আসছে
তাকে খুঁচিয়ে গনগনে ক'রে তোলো।
উঁচু থেকে যদি না হয়
নিচে থেকে করো।

সহযোদ্ধার প্রতি যে ভালবাসা একদিন ছিল
আবার তাকে ফিরিয়ে আনো ;
যে চক্রান্ত
ভেতর থেকে আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে
তাকে নখের ডগায় রেখে
পট্ ক'রে একটা শব্দ তোলো।

দরজা খুলে দাও,
লোকে ভেতরে আসুক।

মুখুজ্যে, তুমি লেখো॥

কাল মধুমাস

আকৈশোর আমার কবিতার অক্লান্ত পাঠক
রামকৃষ্ণ মৈত্র
বন্ধুবরেষু

তোমাকে বলি নি

আকাশে তুলকালাম মেঘে
যেন বাজি ফোটানোর আওয়াজে
কাল
তোমার জন্মদিন গেল।

ঘরে বৃষ্টির ছাট এলেও
জানলাগুলো বন্ধ করি নি—
আলো-নেভানো অন্ধকারে
থেকে থেকে ঝিলিক-দেওয়া বিদ্যুতে
আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তোমার মুখ।

আর মাঝে মাঝে
হাওয়া এসে নড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল
তোমাকে ভালোবেসে দেওয়া
টেবিলে রাখা
গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল।

কাল কেন আমি ঘুমোতে পারি নি
তোমাকে বলি নি—

আমার ফেলে-দেওয়া লেখার কাগজটা নিয়ে
শয়তান বেড়ালটা
কাল সারা রাত খেলেছে।

তোমাকে বলি নি—
দজ্জাল ঘড়িটা
একদিন আমাকে বাজিয়ে দেখে নেবে ব'লে
টিকটিক শব্দে শাসিয়েছে।

তোমাকে বলি নি—

মাটিতে মিশে যাবার পর
আমরা দুজনে কেউই কাউকে চিনব না।

আর দেখ,
তোমাকে বলাই হয় নি
এবার রথের মেলায়
কী কী কিনব—

মেয়ের জন্যে তালপাতার ভেঁপু
তোমার জন্যে ফলফুলের চারা
আর বাড়ির জন্যে
সুন্দর পেতলের খাঁচায়
দুটো বদ্‌রিকা পাখি ॥

জলছবি

ক্যালেণ্ডারে হাত দিস্ নে,
যা ভাগ্, বোকা হাবা!

চেয়ার খালি। জানলা খোলা।
নিরক্ষর হাওয়া
বারে বারে একই বইয়ের
ওল্‌টাচ্ছে পাতা।

ঘড়ির কাঁটায় হাত দিস্ নে,
সময় গোনাগাঁথা।

বারান্দার ফুলের টব,
মেঝেয় ছাড়া চটি,
ব'সে ব'সে শুঁড় নাড়াচ্ছে
মাটির প্রজাপতি।

টেবিলঝাড়া পাখির পালক
ঘরের মধ্যে ওড়ে
খাটের তলায় ছেঁড়া চিঠিটা
বেড়ায় ন'ড়ে-চ'ড়ে।

পা আকাশে, হাত নামানো—
রেলিঙে সার বেঁধে
শুকোয় কাপড়। রঙিন ঘুড়ি
তারে রয়েছে বেধে।

আলো নেভানো। চোখ বন্ধ।
দেখতে পাচ্ছি সবই।

কাঠের বাক্সে পোকায় কাটছে
পুরনো গ্রুপছবি।

একটিবার দৌড়ে এসো
ও নদী, ও স্মৃতি—
ঘরের এই দেয়াল ধ'রে
দাঁড়াও না, লক্ষ্মীটি!

দরজায় কে পর্দা ঠেলছে?
বাইরে যাই। ফিরি।
পায়ের শব্দে নেমে যাচ্ছে
অন্ধকার সিঁড়ি॥

শূন্য নয়

লাবণ্য, একবার তুমি চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাবে মাথার ওপর
শূন্যতা কেবলমাত্র শূন্য নয়; চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা শূন্যে বাঁধে ঘর,
আলো বাঁধে ঘর দেখো অন্ধকারে; দুই তীর দিয়ে বাঁধে নদীও নিজেকে
সমুদ্রে পড়ার আগে। জীবনের সেই এক বৃত্তে ঘুরে আমরা প্রত্যেকে।
জন্মেই মৃত্যুর চিন্তা, প্রেমে জাগে বিচ্ছেদের ভয়, পদে পদে ভুলভ্রান্তি,
অথচ জীবন তার চেয়ে বড়ো, ঢের ঢের বড়ো; শিশিরবিন্দুর শান্তি
ঘাসের ডগায় দোলে, পুলকিত পত্রগুচ্ছ বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে
হাত নেড়ে বলে: বাঁধো, নীড় বাঁধো; লাবণ্য, একবার তুমি তাকাও
আকাশে॥

নিশান

আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে
দুলে দুলে

সারাক্ষণ
দুলে দুলে

নিশান
দুলে দুলে

নিশান
দুলে দুলে

সারাক্ষণ আমার স্মৃতিতে

নাচছে ॥

দ্বৈপায়ন

একাকিত্বের সমাহার ? নাকি—
সমাহৃত একাকিত্ব ?
একে একে দুই, অথবা একের
মধ্যেই আছে দ্বিত্ব ?
বন না বৃক্ষ ? ঘুরে ফিরে শেষে
আজও সেই একই বৃত্ত ॥

খোলা দরজার ফ্রেমে

টেবিলের ওপর ফাটলধরা পাথরটায়
একবাক্স দেশলাই
একরাশ ছাই
আর বিস্তর ধোঁয়াটে কথা

ফেলে ছড়িয়ে রেখে

তিনজন ছোকরা উঠে চ'লে গেল

আড়ালটা স'রে যেতেই
সামনে
খোলা দরজাটার ফ্রেমে
কিছুটা স্থির, কিছুটা অস্থির
একটা ছবি ফুটে উঠল—

আল্‌সেয় ব'সে
মুখে কুটো নিয়ে একটা বুড়ো শালিখ
ঘাড়ের রোঁয়া বার ক'রে
চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে

ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি যাচ্ছে দেখ,
ল্যাম্পপোস্টে
দেখ, ফাঁসি যাচ্ছে
পুরনো বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া চাটাই

তার নিচে
গদিতে বহালতবিয়তে ব'সে
পাগড়ি-বাঁধা একটা লোক

গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেল
রাস্তায় টহলদার
একঠো বঢ়িয়া মাল

মাথার ওপর লম্বা একটা লাঠি উঁচিয়ে
কোলে-পো কাঁখে-পো হয়ে
একটা ট্রাম
তার পেছন পেছন
তেড়ে গেলে
তারের গায়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ঝুলে থাকল
একটা একটানা
ছি
ছি
শব্দ

টেবিলটা মুছতে মুছতে
বয়
দেশলাইটা নাড়াতেই
ভেতরের কাঠিগুলো ঝম ঝম ক'রে উঠল—
আজকালকার ছেলেদের এই আরেকটা দোষ
বড্ড ভুলে যায়

একটা দোতলা বাস
একটু দাঁড়িয়ে
জানলায় একটা মিষ্টি মুখ দেখিয়ে নিয়ে চ'লে গেল

আল্‌সেয় আর সেই শালিখটা নেই

ল্যাম্পপোস্টে তখনও
সামনে ফাঁসি যাচ্ছে

পুরনো বিজ্ঞপ্তির ছেঁড়া চাটাই

তার নিচে
অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে একটা লোক
সাদা পোশাকের পুলিশ
না পকেটমার—
বার বার দেখেও ঠাহর করতে পারলাম না

হুঁশ হল
তিনজন মাঝবয়সী লোক
ল্যাম্পপোস্টটাকে আড়াল ক'রে
সামনের টেবিলে এসে বসেছে

টেবিলে আবার একটা দেশলাই
দূরে ল্যাম্পপোস্ট

এবার ধাড়ি লোকগুলো ভুলে যায় কিনা
দেখবার জন্যে
আমি আরেক কাপ চা চাইলাম ॥

এই মিছিল এই রাস্তা

ওরা ভেবেছিল আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।
আমরা দাঁড়ালাম
ভাঙাকে জোড়া দেওয়া এই সুদূরপ্রসারী মিছিলে।

ওরা ভেবেছিল আর আমাদের কিছুই থাকল না।
মুঠো করতেই
খালি হাতগুলো আমাদের ভ'রে গেল।

ওরা ভেবেছিল দিনকে রাত করতে পারবে।
আমাদের লাল নিশানে
রাতকে দিন করার শপথ গর্জে উঠল।

ডেকে ডেকে আমরা বললাম :
ভুল রাস্তায় এখনও যারা ঘুরছ
যারা এখনও ভুল বুঝছ
ভাইবন্ধুরা আমাদের—
এসো !

দেখ, এই মিছিল
এই রাস্তা ॥

ভুবনডাঙার বাউল এক

যেন
উলানোভার মরালনৃত্যের ভঙ্গিতে

শিয়রে
শুভ্র ফুল—

ভুলু হাসছিল।

ভুলো না, মনে রেখো···
দাস্‌ভিদানিয়া !
লক্ষ্মীটি, এসো আবার····
দাস্‌ভিদানিয়া !
এসো কিন্তু, ঠিক এসো···
দাস্‌ভিদানিয়া ! দাস্‌ভিদানিয়া !

তার হাতের উষ্ণতা
এখনও সেই বিদায়-নেওয়া বন্ধুদের হাতে—
ক্রেমলিনের লাল তারার চোখে চোখ রাখা
শার্সিগুলোর গায়ে
তার গেয়ে আসা গান এখনও গমগম করছে ;
পার্কের মাটিতে তার পুলকিত পদচিহ্ন
বরফ না পড়া পর্যন্ত থাকবে।

ভুলু হাসছিল।

প্রার্থনা শেষ ক'রে গান ;
গান শেষ ক'রে
জনাকীর্ণ ঘরে উঠোনে রাস্তায়

স্নেহ প্রেম প্রীতি সখ্য
চোখের শূন্যতাকে
সযত্নে স্মৃতির কোলে তুলে দিল

লাল মাটির ধুলো উড়িয়ে
হাতে একতারা নিয়ে
ঘুঙুর-পায়ে বাউল হাওয়া
আনন্দে নাচতে নাচতে
চ'লে গেল···

যেদিকে খোয়াই
যেদিকে শালবন

যেখানে জননী
যেখানে জন্মভূমি ॥

লাল গোলাপের জন্য

আমারও প্রিয় রং লাল ;
আমারও প্রিয় ফুল
গোলাপ।

আমি লড়ছি
লাল গোলাপের জন্যে।

চেয়ে দেখ,
আসমুদ্রহিমাচল
শোকস্তব্ধ আমাদের ভালোবাসা
নতমুখে
উদ্ভিন্ন মাটির দিকে তাকিয়ে।

শৃঙ্খলের ক্ষতগুলো
ভাল ক'রে আজও শুকোয় নি ;
প্রাণের সব তার
এক সুরে এখনও বাঁধা হয় নি ;
সর্বনাশের কিনার থেকে
পৃথিবী
বরাবরের মতো এখনও স'রে আসে নি।

চষা মাটির মতো এবড়ো খেবড়ো সময় ;
চলতে কষ্ট হলেও
জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।
আশাহত অবুঝ অশান্ত
আমাদের আজকের অভিমানগুলো
চোখের জল ফেলে
নবান্নের উৎসব করবে।

চোখে নয়,
এখন আমাদের বুকের মধ্যে লাল গোলাপ—
বুক দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

আমার প্রিয় রং লাল ;
আমার প্রিয় ফুল
গোলাপ।

লাল গোলাপের জন্যে
সাহসে বুক বেঁধে
এখন আমাদের লড়াই ॥

কুকুর ইঁদুর মাছি ফুলের গাছ

পর্দাটা উসখুস করছে হাওয়ায়
যেন কেউ
আসবে কি আসবে না ভাবছে।

নিচে কারো চেনে-বাঁধা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।
মশারির দড়িতে কয়েকটা মাছি,
ইঁদুরগুলো আলমারির আড়ালে অদৃশ্য
বারান্দায় সারবন্দী টবে
ফুলের গাছ

ইলেকট্রিক পাম্পে ঝিঁঝি-লাগা ফ্ল্যাটবাড়িটা
যেন মহাশূন্যে ঝুলছে।
দেয়ালে

ঘড়ির কাঁটায় বিদ্ধ সময় ;
সমস্ত ভার হারিয়ে ফেলে আমি যেন ভাসছি।

পাম্পের শব্দ হঠাৎ থেমে গেলে
বাইরে এসে দাঁড়ালম।
আমাদের এই শুক্‌নো খট্‌খটে রাস্তায়
কয়েকটা গাড়ি
ভিজে পায়ে
জলের দাগ বুলিয়ে চ'লে গেল।

জামাটা গায়ে গলিয়ে
ছুটে গিয়ে একবার দেখে এলে হত—

ঠিক কত দূরে
আশ্বিনের কানা মেঘ
এই পৃথিবী ছেড়ে আর কোথাও
যাবে কি যাবে না এই দ্বিধায়
রোদ আর বৃষ্টি দিয়ে
নিজেকে দু-ভাগ করছে ॥

সকালের ভাবনা

দুধের গাড়িটা মোড় ঘুরতেই
পাশের বাড়ির ছাদে
মোরগগুলো ডেকে উঠল।

অন্ধকারকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে
সকালের প্রথম ট্রামও
এক্ষুনি যাবে।

তারপরই চলন্ত সাইকেলে
দু-পাশের গাড়িবারান্দায়, রেলিঙে ফুলের টবে,
ঘরের মেঝেয়
গালে চড় মারবার শব্দে
সকালের কাগজগুলো
ঠাস্ ঠাস্ ক'রে
পড়তে থাকবে।

রাত্রে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে ভেবেছি
মাঠে ধান দাঁড়িয়ে ;
এখন বৃষ্টি হওয়াটা ভয়ের।

কাল দিনটা কেমন গেছে
ছাপার হরফে
একটু বাদেই জানতে পারব।
আজকের দিনটার মনে কী আছে
এখনও জানি না।

হাত মুঠো করছি
আর খুলছি।
মুঠো করছি
আর খুলছি।

যে দিনটাকে আমি চাই
কিছুতেই মিলছে না॥

পারঘাটের ছবি

এপারে গিলে ওপারে ওগ্‌রাবে।

এমনি ক'রে ফেরির লঞ্চে
উদয়াস্ত
দুই পারের যেন দু-হাতে
আপন মনে
নিরন্তর
        ঢাল-উপুড়
                ঢাল-উপুড় খেলা।

মাঝনদীতে জল ঘোলাচ্ছে
                মাটি-কাটার জাহাজ।
মধ্যে মধ্যে দোলাচ্ছে মন
গেরুয়া রং ঢেউ।

ধানের কী দর ?
ভজ গোবিন্দ !
আসেন বাবু, ভাল হোটেল।
ভজ গোবিন্দ !
আসেন।

চা পান বিড়ি
সবেদা কলা
কাঁঠাল আম মুরগি মাছে
জ'মে উঠেছে ফেরিঘাটের বাজার।

ঝোলানো ব্যাগ। পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি। টিনের সুটকেসে
পড়ার বই,

সিঁদুরকৌটো,
মেলায় তোলা ফটো,
গলার কণ্ঠী, পুরনো তাস,
কাঁথা এবং আদালতের নথি।

নাচতে নাচতে আসছে লঞ্চ।
নাচতে নাচতে যাবে।

এপারে গিলে পুরো ছবিটা
ওপারে ওগ্‌রাবে॥

মর্সিয়ার পর

রাস্তায় লাইনবন্দী শোক
রাস্তায় লাইনবন্দী শোক

মিছিল
যেন ফুরোতে চায় না

আগে আগে
            আগে আগে
মুখ নিচু ক'রে আছে
দুলদুল

পিঠে সওয়ার নেই
পিঠে সওয়ার নেই

পেছনে থেমে থেমে
থেমে থেমে
মহরমের বাজনা

হায় হাসান হায় হোসেন
হায় হাসান হায় হোসেন ব'লে
বুক বাজাতে বাজাতে চলেছে আমার ভাই

আর আমি
ঠা ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দেখছি

মাটির ফুটো সরা থেকে
ফোঁটা ফোঁটা
জলে
নিষ্পত্র মরা ডালে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে
        চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে—

নতুন জীবনের
বীজমন্ত্র ॥

ছি-মন্তর

লাগ লাগ লাগ ভেল্‌কি ।
চাল-চিনি-মাছ তেল-ঘি ॥
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি খিড়কির দোরে ।
চোর নিয়ে যায় পুলিশ ধ'রে ॥
ওঁ হ্রীং স্বাহা ওয়াগন ফট্‌ ।
যে বেটা নজর দিবি সে বেটা হট্‌ ॥

কানামাছি ভোঁ ভোঁ ।
ছুঁয়ে দিয়েছি ঘোষের পো ॥
দিল্লী থেকে ছাড়লাম ডাক ।
যেইখানের ধনী সেইখানেই থাক ॥

লাগ লাগ ভেল্‌কি ।
হুকুমতের খেল্‌ কী ॥
বাড়লে বেশি বাতচিত ।
সদাচারের সৎ চিৎ ॥

কাছের লোক

দরোজা খোলো,
ফিরে এসেছি—
ফিরে এসেছি দেখ।

দূরে গিয়েছি
দূরে থাকি নি
ফিরে এসেছি দেখ।

কাছে থাকব
দূরে গেলেও
কাছে থাকব
দূরে গেলেও

ফিরে এসেছি দেখ।

দরোজা খোলো,
ফিরে এসেছি—
দরোজা খোলো
ফিরে এসেছি
দরজা খুলে ডাকো॥

জননী জন্মভূমি

আমি ভীষণ ভালোবাসতাম আমার মা-কে
—কখনও মুখ ফুটে বলি নি।
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু
—শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভ'রে উঠত
আমার ভালোবাসার
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারি নি।

হে দেশ, হে আমার জননী—
কেমন ক'রে তোমাকে আমি বলি!

যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি—
আমার দু-হাতের
দশ আঙুলে
তার স্মৃতি।

আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই,
হে জননী,
তুমি।
আমার হৃদয়বীণা
তোমারই হাতে বাজে।

হে জননী,
আমরা ভয় পাই নি।
যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে
আমরা তাদের ঘাড় ধ'রে
সীমান্ত পার ক'রে দেব।

আমরা জীবনকে নিজের মতো ক'রে
সাজাচ্ছিলাম—
আমরা সাজাতে থাকব।

হে জননী,
আমরা ভয় পাই নি।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে ব'লে
আমরা বিরক্ত।

মুখ বন্ধ ক'রে,
অক্লান্ত হাতে—
হে জননী,
আমরা ভালোবাসার কথা ব'লে যাব॥

একটি পোলিশ কবিতার ভগ্নাংশ

মনে হবে তুমি
যেন জ্বলন্ত মশাল
ভগ্নকণায় বায়ুমণ্ডল ঠাসা—
তুমি তো জানো না ভবিতব্যে কী আছে—
মুক্তি? অথবা নিয়তি সর্বনাশা!

ঝঞ্ঝা কি শুধু টানবেই রসাতলে?
শুধুই ভস্ম! শুধু নিরাকার ধ্বনি।
নাকি দিন গোনে মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল—
ভস্মের নিচে সেই তো বজ্রমণি॥

এদিকে

ওদিকে প্রচণ্ড তর্ক,— 'এটা ঠিক', 'না, এইটে ঠিক' ব'লে।

ঘন ঘন উঠছে নামছে তাপমানযন্ত্রের পারদ।
কিছু তালেবর লোক তাল বুঝে কত্তালে শ্রীখোলে

'লেগে-যা', 'লেগে-যা' বোলে রব তুলছে : নারদ! নারদ!

এদিকে রাস্তার জল ভাসতে ভাসতে রসাতলে নামে।
চ'লে যাচ্ছে টলতে টলতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঝাঁঝরিতে
কাগজের নৌকোগুলো। হা হতোস্মি! দক্ষিণে ও বামে।
ছিঁড়ে খাচ্ছে শুঁড়ি ছুঁড়ি গনৎকার পুরুত পাদরিতে।

ব্যস্, এ কোরাস শেষ॥

'আমার এ গল্পের নায়ক
কুমোরটুলিতে থাকত; যতই সে বানাত প্রতিমা
লোকে ফেলে দিত জলে,— বারোমাস এই বাঁধা ছক॥

একদিন ধুত্তোর ব'লে স'রে পড়ল গায়ে দিয়ে নিমা
পাশের গলিতে,— সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে সুশীলা-ফুসিলা—

ভাল ক'রে নেড়ে চেড়ে দেখল ভারি সুন্দর বানানো
ঈশ্বরের জীব।

ফিরে এসে বানাল সে পুতুল রঙ্গিলা।
খুব কাটল। উপরন্তু যত্নে রইল ঘরে ঘরে।
জানো?'

রামো রামো !

শেষে কিনা এই গপ্প !

—ওহে ব'সে পড়ো !

বুঝেছ ? আদতে দোষটা হল গিয়ে চোখের ঠুলির—
কেননা সমস্যাগুলো ওর চেয়ে ঢের ঢের বড়ো ;

পৃথিবীর মানচিত্রে নামও নেই কুমোরটুলির ॥

আসলে যে চরিত্রটা নিয়ে এত কাণ্ড, এত গলাবাজি—
সে কিন্তু সমস্ত বোঝে ।

এবং সে

বাজারেও যায়

থলি হাতে।

পৃথিবীকে ঢেলে সাজতে সেও খুব রাজি।

ভোর হবে। তাই এত অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায় ॥

ফোঁটা

ভাই আমাকে বকুক ঝকুক
দিক গে যতই খোঁটা—
যমের দুয়োরে কাঁটা দিচ্ছি,
ভাইয়ের কপালে ফোঁটা।

ভাইয়ের সঙ্গে আড়ি আমার,
ভাইয়ের সঙ্গে ভাব—
সেলাই করি তারই মাপে
রাজার কিংখাব।

কাঠ কুড়োচ্ছি বনে,
ভাই রয়েছে রণে—
নিজের হাতে বেঁধে দিয়েছি
তরোয়ালের খাপ।

ভাইয়ের হাতে সে সে অসি
ঝলমল করে!
অন্ধকারের সিংহাসন যে
টলমল করে!

দিনের স্মৃতি বুকে রেখেছি,
স্বপ্ন চোখের কোলে—
কখন যে ভাই ঘরে ফিরবে
ঘুমে পড়ছি ঢ'লে।

ফুল তুলেছি বনে,
দেখে রেখেছি কনে—

হাত পুড়িয়ে রেঁধে রেখেছি
ভাইকে দেব ব'লে।

শেকলগুলো ভাঙছে কোথায়
ঝন্ ঝন্ ক'রে!
নিশান ওড়ে, রথের চাকা
বন্ বন্ ঘোরে!

ভাই এনেছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি,
খুলে ফেলেছে তালা
দেখ ও ভাই, তোমার জন্যে
গেঁথে রেখেছি মালা।

ভাই আমাকে নাই বা দেখুক,
মারুক লাথি ঝাঁটা—
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়োরে কাঁটা॥

ভুলে যাব না

চায়ের দোকান।
তুমুল তর্কে
চিড় খাচ্ছে টেবিল।
হঠাৎ আওয়াজ।
মাটিতে পা ;
হাত আকাশে। মিছিল।

দৃষ্টি বদল।
হাতে বেঁধেছ
হাত। করেছ ঋণী।
ভুলে যাই নি।
ভুলে যাব না
জীবনে কোনোদিনই॥

পাড় ভাঙছে।
ছইয়ের ভেতর
আলো দুলছে। হাওয়া।
সকাল বেলায়
ডাঙায় পৌঁছে
বন্দরে চা খাওয়া।

গলা মিলিয়ে
গেয়েছি গান—
'মা আমার বন্দিনী'।
ভুলে যাই নি।
ভুলে যাব না
জীবনে কোনোদিনই॥

এপারে ঘর।
ওপারে ঘর।
মধ্যে কঠিন দেয়াল।
ভোজের পাত
পেতে রেখেছে
ধুরন্ধর শেয়াল।

শুকনো মুখে
বলেন মা, 'কী
পেলাম বল্‌ দিনি ?'
ভুলে যাই নি।
ভুলে যাব না
জীবনে কোনোদিনই॥

কালো বেড়াল

একগাদা লোক পুকুরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে
মাছ-ধরা দেখছিল।
ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে
নিজেকে আমি সামলে নিলাম।
বেলা ব'য়ে যাচ্ছে—

পা চালিয়ে, ভাই!
পা চালিয়ে।

শো-কেসের জানলায় নিজের ছায়াটাকে লট্‌কে
একটু নেড়ে চেড়ে
দেখে নিলাম—

এককালে যা শোভা পেত
এখন আর তা শোভা পায় না।

পেছন থেকে কেউ আমার নাম ধ'রে ডাকল—
আমি নই।
আজ কেউ তরুণ গলায়
আমার নাম ধ'রে ডাকবে না।

মনুমেন্টের নিচে সভা।

সভা নয়—
দাঁত তোলার আগে বক্তৃতা দিচ্ছে
ম্যাজিক-দেখানেওয়ালা এক হেকিম।

গলিতে গলিতে মিছিল।

মিছিল নয়—
পাকানো মুঠোগুলো খুলে
লাইন বেঁধে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে
রেশনের থলি।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম
মাসভর একাদশী পড়ার রাগে
আমাদের কালো বেড়াল
গেল মাসের ক্যালেণ্ডারের পাতাটা
নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে—

কেবলি আঁচড়াচ্ছে ॥

আমার ছায়াটা

আগুন মুখে ক'রে
একটা দড়ি
বেড়ার গায়ে ঝুলছিল

সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
দেয়ালের গায়ে
চোখ পড়ল

ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে
আমাকে অবিকল নকল করছে
আমার ছায়া

মাথায় আমারই মতো পাখির বাসা
চোখে চশমা
ঠোঁটে সিগারেট ধরা

ধোঁয়ার জায়গাগুলো নিখুঁতভাবে ফোটালেও
আমি লক্ষ্য করলাম
আগুনের জায়গাটা
ইচ্ছে ক'রেই যেন চেপে গেল

দেয়ালের গা থেকে ছায়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে
ফুটপাথে আমি আছড়ে ফেললাম
তারপর টেনে
হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গেলাম
একটা গাছের নিচে

ছায়াটাকে রেখে বেরিয়ে আসছি

আমাকে টপকে
পেছন থেকে সামনে লাফিয়ে পড়ল
আমার সেই ছায়া

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সরিয়ে নড়িয়ে
অনেক চেষ্টা ক'রেও
আমি তাকে ছাড়াতে পারলাম না

তখন আমি এই ব'লে তাকে শাসালাম

শয়তান
এবার আমি আগুনের মধ্যে যাব ॥

হাত বাড়ালে

কোন্ দিকে ? কোথায় তুমি যাবে ?
মোড়ে মোড়ে
অন্ধকারে ধ'রে আছে ডাল
সারি সারি প্রশ্নচিহ্ন—

হেঁট মুণ্ডে
ঝুলছে পঞ্চবিংশতি বেতাল।

কাকে কী উত্তর দেবে, কাকে কী বোঝাবে ?
চারিদিক ছিন্নভিন্ন ;

সভার বিরুদ্ধে সভা ব'সে গেছে,
সমিতির বিরুদ্ধে সমিতি।

পিছনে তাকালে স্পষ্ট দেখতে পাই—
এখনও বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে আছে
প্রিয়তম স্মৃতি ;
এখনও মধুরতম গান বাজে
সমবেত কণ্ঠের আওয়াজে।

রক্তে পা ডুবিয়ে হাঁটছে
নিষ্ঠুর সময়,
সারা পৃথিবীকে টানছে
রসাতলে
এখনও আকাশচুম্বী ভয়।

অথচ সামনেই হাত আরেকটু বাড়ালে—
রয়েছে বন্ধুর হাত,
সুখশান্তি,
বাঞ্ছিত জগৎ—

যদি একবার বোঝো তুমি

থুথু দিয়ে জোড়া যায় না,
জুড়তে হয় ভগ্ন মনোরথ—
এ আগুনে,
এই রাংঝালে॥

আশ্চর্য কলম

এই যে দাদা, এতদিনে বেরিয়েছে—
        ফরমুলায় তৈরি
খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম : 'খাই-খাই।'

চোর, জোচ্চোর, লোচ্চা, লম্পট, খাজা, খোজা,
পণ্ডিত, মূর্খ যে-কেউ চোখ বুঁজে
রাতারাতি লেখক হতে পারে।
এ কলম হাতে থাকলে
বসা বা দাঁড়ানো, চিৎ বা উপুড়
যে-কোনো অবস্থায়
প্রকাশ্যে ঝোপ বুঝে কোপ দেওয়া যায়—
কোনোরকম তাগবাগ বা রাখঢাকের দরকার হয় না।

দিনকে রাত, সোজাকে কাত,
হতাশকে হাত করতে
এ কলমের জুড়ি নেই।
মনে রাখবেন, নতুন ফরমুলায় তৈরি
খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম
'খাই-খাই।'

রাঘববোয়াল থেকে চুনোপুঁটি
হরেক সাইজের পাওয়া যায় ;
দাম উত্তম মধ্যম হিসেবে।
সঙ্গে বিনামূল্যে চুন এবং কালি।

এ লাইনে
যদি কোনো ভদ্রলোকের আবশ্যক হয়
বলবেন॥

বন্ধু

চাঁদনিতে মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে টর্চ।
চোখে হাত চাপা দিয়ে
আলোগুলো
আঙুল দিয়ে অন্ধকারকে দেখাচ্ছে।

জলের পাম্পগুলো
থেকে থেকে হরবোলার মতো
কখনও ঝিঁঝির ডাক, কখনও সাইরেনের শব্দ
নকল ক'রে চলেছে।

পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
ছায়ার মতো মানুষ ;
চেনা মুখগুলোও
এই অন্ধকারে আমি চিনতে পারছি না।

আমার কাঁধে
এখন কেউ এসে যদি হাত রাখে
আমি চমকে উঠব।
এ অন্ধকারে
কেউ যদি আমাকে আলো দেখায়
আমি তার হাত মুচড়ে দেব।

কেননা
অপরিচয়ের এই অন্ধকার
এখন আমাদের বন্ধু ॥

খড়ির দাগে

ওপরে আকাশ নীল ব্যথার মোচড়ে

দাঁড়িয়ে রাস্তার মোড়ে
একে ওকে তাকে হাত দেখাচ্ছে পুলিশ

ইস্
সে ফুঁকেছে শিঙে
চৌপহর দিন ঝুলত যার উলিডুলি ফতুয়াটা
পিছনের লোহার রেলিঙে
ছানিপড়া চোখে চশমা আঁটা
সেই তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা
হাত-দেখা
গনৎকার বুড়ো

ফুটপাথে খড়ির দাগ মোছে নি এখনও

সে জায়গায় ব'সে প'ড়ে
ঘ'ষে ঘ'ষে গুঁড়ো
নতুনের মতো করছে যা কিছু পুরনো
কোথাকার কোন্ এক ফড়ে

ফুটপাথে খড়ির দাগ দেখাচ্ছে অদ্ভুত
জন্ম মৃত্যু প্রেম জরা যৌবন শৈশব
ভূতভবিষ্যৎ সব

ধ্যুৎ!
মনকে বোঝাই।
ছাই!

কষ্ট কিছু হচ্ছে বটে জুতোর পেরেকে
দেখে শুনে পা রেখে পা রেখে
এই আর একটু পথ যেতে পারলে, ব্যস্‌
সমস্ত অভ্যাস

ঘুরে ঘুরে কী নতুন খেলনা উঠল দেখি
আরে আরে এ কী
মারলে দেখি মধুর আওয়াজে

রুনুঝুনু বাজে
বাহবা বাহবা বাঃ ব্রেভো

এবারের জন্মদিনে এই খেলনাটাই কর্তাব্যক্তিদের দেব

শুনতে পাচ্ছি দূরে ভাগ্যচক্রের ঘর্ঘর
কাছে এলে ঝুলে পড়ব যত হোক ভিড়

রাস্তার ঝাঁঝরির মুখে বিড়বিড় বিড়বিড়
জানি না কে আউড়ে যাচ্ছে কিসের মন্তর ॥

সাফাই

শেষ লড়াইয়ের গড়খাইগুলো
বড়ো বড়ো বাড়ির গাঁথনিতে
এখন অদৃশ্য।
নাকে দড়ি বেঁধে
আগে যেখানে ভালুক নাচ হত—
সেখানে এখন ভুঁড়ি নাচিয়ে
লিফ্‌টে উঠছে নামছে
কালোকে শাদা করার হাত-সাফাই।

গিয়ে দাঁড়াতেই
ডান দিক থেকে একজনকে উনিশ বলতে শুনে
বাঁ দিক থেকে যেই একজন বলেছে বিশ
সামনে থেকে তক্ষুনি আর একজন একোইশ ব'লে
আমাকে ডেকে নিল॥

আমার কাজ

আমি চাই কথাগুলোকে
পায়ের ওপর দাঁড় করাতে।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।

কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।

আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও॥

হালুম

রাত্তিরে শেষ শো-র পর
সচ্চরিত্র দর্শকেরা
যে যার বাড়িতে এখন
বন্ধ চোখের পর্দায় বিনা সেন্সারে
ছবি দেখছে।
একটু আগে অবিরাম কাশতে কাশতে
বজবজের তেল, বাটার জুতো
ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গেছে
মাঝরাতের মালগাড়ি।

হঠাৎ চিড়িয়াখানার বাঘগুলো
গাঁক গাঁক ক'রে ডেকে
শহরটাকে চল্‌কে দিল॥

এই জমি

কারো মুখের কথায় আর আমার আর বিশ্বাস নেই।
আমি হাতেনাতে প্রমাণ চাইব।
আমাকেও কেউ মুখের কথায় বিশ্বাস করুক
আমি চাই না—
আগুনে
রক্তে
সংঘাতে
সবাই আমাকে বাজিয়ে নিক।

এই অন্ধকারে সেই বীভৎস মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি—
একদিন কথা দিয়ে যারা আমাকে ভুলিয়েছিল।
জিঘাংসার যে নামই তারা দিক,
যুদ্ধকে যে পোশাকই তারা পরাক,
মৃত্যুর কোনো রমণীয় নামে
আর আমি ভুলছি না।

আসমুদ্রহিমাচল
আমার বিশ্বাসের জমি।
আমাকে কথায় ভুলিয়ে
সে জমি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না॥

ফড়েদের প্রতি

আমি জানি, আমি দাবা খেলতে বসলেই
পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়বে এক লক্ষ ফড়ে—
যে যার হাতের কাজ ফেলে রেখে
আমার প্রত্যেকটা চাল
পাখি পড়ানোর মতো ক'রে ব'লে দিতে চাইবে।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না,
এর পর
আমি কি তাদের করজোড়ে বলব—

হে ভদ্রমহোদয়গণ,
হয় চুপচাপ ব'সে থেকে দেখুন,
নয় যে যার জায়গায় ফিরে যান

আমার খেলাটা, দোহাই
এখন থেকে আমাকেই খেলতে দিন ॥

সান্ধ্য

একটু আগে হাওয়ার একটা হল্লা এসে
মারমুখো মেঘগুলোকে
তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

গঙ্গার ধারে গাছগুলো
কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল
বৃষ্টির কয়েক ফোঁটা।

আর আমাদের প্রায় ঘাড়ের ওপর দিয়ে
লাইনে পা টেনে টেনে
বুড়োর মতো কাশতে কাশতে চলে গেল
একটা মালগাড়ি।

আমরা ছেলেবেলার দুই বন্ধু
সাঁকোর ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম
দড়ির আগায় কী যেন বেঁধে
যারা কাঁকড়া ধরতে বসেছিল
আলো পড়ে এলে
খালি হাতে তারা উঠে চলে গেল।

জেটির গায়ে কিলবিল করছে
নোঙর-বাঁধা নৌকো।
ছইয়ের ভেতর লণ্ঠনগুলো জ্বলল।
একটা জ্বলন্ত কাগজ
হাত ছেড়ে দিয়ে
স্রোতের ওপর
বেশ খানিকক্ষণ মজা ক'রে ভাসল।

আমাদের নাকের ডগায় একটা জাহাজ

জলের ওপর থেবড়ে ব'সে
মেয়েদের মতো হাঁটুদুটো দু-পাশে এলিয়ে দিয়ে
কাঁটা হাতে
যেন বুনতে বসেছে।

তার
কোলের ওপর খেলা করছে
স্তব্ধতা।

একটা শান-বাঁধানো বেঞ্চিতে
আমরা অনেকক্ষণ
বসে থাকলাম।

জীবনটাকে চিনেবাদামের খোলায়
ছাড়াতে ছাড়াতে
যখন প্রায় ফুরিয়ে ফেলেছি—
পেছনে পায়ের শব্দে
তাকালাম।

একটি ছেলে
আর একটি মেয়ে
বসবে ব'লে
উসখুস করছে।

ফেরবার তাড়া ছিল ব'লে
আমরা দু-জনেই
একই সঙ্গে উঠে পড়লাম।
তখনই চোখে পড়ল

নদীর ওপারে
রাস্তার আলোগুলো
অন্ধকারের গলায় সন্থ মালা পরিয়ে দিয়েছে ॥

খেলা দেখে যান

মাথার ওপর
খাটানো নীল
বিনিপয়সার তাঁবু।
নিচে সবুজ
গাল্‌চে পাতা।
খেলা দেখে যান, বাবু!

ঢোলক বাজে
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ভরসন্ধেবেলা।
হাজার ঢেউয়ের
হাততালিতে
জমে উঠেছে খেলা।

বাঃ বাহবা!
বাহবা বাঃ!
সাবাস বলিহারি—
হাঁড়ির মধ্যে
মাটি আছে, না
মাটির মধ্যে হাঁড়ি!

এই ছিল না—
এই তো আছে!
এই আছে, এই ফক্কা।
বুকের মধ্যে
রঙের তাস
হরতনের টেক্কা।

জোনাক জ্বালে
ঝাড়লণ্ঠন।
কেই বা জানে কী ঠিক!
গোঁফটা ঢেকে
পুপের বেড়াল
চাইছে হাফটিকিট।

মাথার ওপর
টাঙানো নীল
বিনিপয়সার তাঁবু।
খেলা দেখে যান!
খেলা দেখে যান!
খেলা দেখে যান, বাবু॥

যা হট্

নায়েব, গোমস্তা, বাঈজি, মাহুত, সহিস
তোশাখানা, রাতকে-দিন-করবার ডায়নামো
সব চাই, নইলে গ্রামে থাকাই বোকামো—
বোতলকে-বোতল ক'রে দৈনিক হাবিস
আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে দিতেই চম্পট
সে-গদ্দিতে বসতে গেল যে তার ওয়ারিশ

কালের সেপাই এসে ঘাড় ধ'রে তুলে দিয়ে বলল : যা—হট্ !

উঠে আসছে শক, হূণ, কুষাণ, পহ্লবী
স্বপ্নাদ্য কলমে ; হচ্ছে ছাপাই বাঁধাই ;
বই যা ভারি, বইতে পারে একমাত্র গাধাই—
কী মজা, লিখলেই সব হয়ে যাচ্ছে ছবি !
মগজে ডবল শিফ্‌টে তৈরি ক'রে প্লট
যেই না নেবার চেষ্টা লেখক পদবি

কালের সেপাই এসে ঘাড় ধ'রে তুলে দিয়ে বলল : যা—হট্ !

আমাদের মুক্তকচ্ছ রণছোড় বাবাজি
ভোটযুদ্ধং দেহি ব'লে আঁটেন মালকোঁচা
যাকেই তাকিয়ে মনে হয় খাঁদাবোঁচা
তাকেই আটকান জেলে। কারণ, সে গররাজি
মন্ত্র পড়তে গণতন্ত্রে ওঁ স্বাহা ফট্—
পাঁচসালা উৎরে দেবে সত্যি কি ভোজবাজি ?

কালের সেপাই ব'সে খেলা দেখে।
এবার বড়ের চালে কিস্তি পড়বে ?
নাকি হবে মন্ত্রীর পালট ?

হেঁ-হেঁ আলির ছড়া

কাণ্ড

মহকুমার সদরে ভাই
দেখে এলাম কাণ্ড
একজন ডালে একজন পাতায়
খোঁজে গাছের কাণ্ড
দেখতে তালপাতার সেপাই
মাথাগুলো প্রকাণ্ড

তাকায় না ফলফুলে
লক্ষ্য একদম মূলে
বলে না অবিশ্যি খুলে
তারা ছাড়া বাকি সবাই
কেন অকালকুষ্মাণ্ড

এ কয় ওরে, শিখো রে
পৌঁছুতে হয় কী ক'রে
সোজা সটান শিকড়ে—

ব'লে যেই না হাত ছেড়ে দেয়
চিৎ ক'রে দেয় ব্রহ্মাণ্ড ॥

বাঘে

চরাতে নিয়ে গিয়েছিলম গো মালিক
        তিন শো শব্দ গো
            মালিক
                তিন শো শব্দ
ফিরে এলম গো মালিক

তিনটে কম গো
মালিক
তিনটে কম

একটি ছিল আগে
সেটিকে পেয়ে বাগে
খেয়ে নিলে হালম গো মালিক
খেয়ে নিলে হালম।

দুটিকে দিলে খোঁয়াড়ে
ও-পাড়ার সেই চোয়াড়ে।

একটি ভূত
একটি ভগমানের পুত—
ভালোবাসা ছিল সবার আগে গো মালিক
ছিল গো মালিক আগে—
তাকেই খেলে বাঘে॥

তিন্তিড়ী

তেঁতুলতলায় শব্দ কিসের
বিশ্রী বিদিকিচ্ছিরি—
কে ওখানে? কে হে?

এজ্ঞে, আমি হেঁ-হেঁ—
অন্ধকারে চোখটা জেলে
খুঁজে বেড়াচ্ছি তিন্তিড়ী।

ঢুকব কি না ঢুকব দেহে—
মুখপুড়িটা আমায় ফেলে
দিয়েছে দেখুন, কী বিষম সন্দেহে॥

কাছে দূরে

মুখখানি যেন ভোরের শেফালি
নেমে গেল এক্ষুনি
দু-অধরে চেপে চাঁদ এককালি
নেমে গেল এক্ষুনি

তার দুটি আঁখি খঞ্জন পাখি
দূরে কাছে ঘুরে নাচে
এই আছে এই নেই আছে নেই
দূরে কাছে ঘুরে নাচে

নেমে গেল এক্ষুনি

হাওয়া বারে বারে আঁচল সরায়
হাত বারে বারে ঢাকে
হাত খালি হলে আঙুল জড়ায়
সময়কে পাকে পাকে

নেমে গেল এক্ষুনি

ঝুঁকে প'ড়ে চোখে চূর্ণ অলক
যেন চায় পড়ে নিতে
শ্বেতপাথরের স্মৃতির ফলক
মণি-জ্বলা চারিভিতে

নেমে গেল এক্ষুনি

পদচারণায় দূরে নিয়ে যায়
তার কায়া তার ছায়া

ভু-চরণে বোনা যাব কি যাব না
ও-বনে ও-যৌবনে

নেমে গেল এক্ষুনি

থাকতে দেখি নি চেয়ে অকপটে
তার সে মুখচ্ছবি
দেখি আকাশের প্রচ্ছদপটে
ছাপা সে মুখচ্ছবি

নেমে গেল এক্ষুনি
ট্রেন খালি ক'রে ভোরের শেফালি
নেমে গেল এক্ষুনি ॥

রোদ্দে দেব

আমরা বড়োরা কেন বার বার
পালিয়ে এ-ঘরে এসে
চোখ মুছি ?
মেয়েটা অবাক হয়,
ভাবে—

আমরা নিশ্চয় কাঁদছি !
তা যদি না হবে—
আমাদের চোখে কেন জল ?

বোকা মেয়ে !
কী ক'রে বোঝাই—

কখনও কখনও
চোখের কুয়োয় জল তোলে
কান্না নয়
—জ্বালা !

বোকা মেয়ে !
ভিজে কাঠে যখনই ফুঁ দিই—

কিছুতে ধরে না আঁচ,
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
চোখে ধরে জ্বালা ;
যেদিকে তাকাই দেখি
সমস্ত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার।

চোখের জ্বালায়

আমরা বাইরে আসি
চোখ মুছি

চোখে আমাদের তাই জল।

জীবনের এই হাল
তা ব'লে বছরভর নয়—
কেবল বর্ষার ক-টা মাস।

শুকনো কাঠে
গন্‌গনে আগুনে হবে
দেখতে দেখতে ভাত—
তখন আবার সব যেখানে যা আছে
ঠিকঠাক
স্পষ্ট দেখতে পাব

বর্ষা গেলে
কাঠকুটো, ভিজে সব কিছু
রোদে দেব

রোদে দেব
এমন-কি হৃদয়ও ॥

কাল মধুমাস

বার বার ফিরে আসা নয়।
পারাপার
নয়।

শুধু যাওয়া।

এখন কথাটা হল,
কখন কী ভাবে
যাবে—
আকাশের কেমন আবহাওয়া।

মনে রেখো,
এ নদীতে একবার
শুধুই একবার
একটি মাত্র খেপ।

তা নিয়ে আক্ষেপ
করবার
পাত্রই আমি নই।

একবার
একবারই সই।
কথাটা, কী ভাবে
যাবে—

ক্ষণে ক্ষণে
মরতে মরতে ?
না কি বেঁচে

নেচে নেচে
ঢেউয়ের মাথায় ?

হালে পানি, পালে হাওয়া
না লাগে লাগুক—
কী আনন্দ, কী সুখ

যায় দিন, যায় ॥

২

যদিও আবাল্য চোখে দেখে আসছি কম
ইদানীং ডান কানে
ইস্,
একদম শুনছি না—
দ্রোণাচার্য তুচ্ছজ্ঞানে
নেন নি ভাগ্যিস
বাল্যে বুড়ো আঙুল দক্ষিণা।

পারলে তাই দেখাতে ভুলি না
যখন যেখানে যাকে
দেখানো দরকার।

যৌবন বিদায় নিয়ে
এতক্ষণে পৌঁছে গেছে যেখানে যাবার।
মিষ্টি হেসে
হাত নেড়ে তাকে বলেছিলাম, বিদায়!
মেয়েলি ঈর্ষায়
প্রৌঢ়ত্বও করছে যাব-যাব।
এবার তাই ঠিক করেছি, যাবার সময়

দু-হাতে লাল নীল দুটো রুমাল ওড়াব।
তারপর টুকটুক্ ক'রে বাড়ি ফিরব শনৈঃ শনৈঃ।

সময় তো জানোই—
নয় ব্যাকরণের অব্যয়।
যখন যে পদে থাকে
সেইমতো আকার।
সময়ের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ পাতাই
ছোটো, বড়ো, গোল, চৌকো নানান মাপের।
সময়টা এক নয়—
এর ওর তার।
তোমার সময় দিয়ে তাই
বৃথা চেষ্টা আমাকে মাপবার।

তুমি ব'সে কাজ করো।

আমি উঠি।
যাই
গিয়ে দেখে আসি
কোথায় আকাশটা খুব বড়ো।
দেখে আসি পড়ো-পড়ো
কোথায় কখন কোন্ খুঁটি।
যাই
গিয়ে দেখে আসি
কী বীজ বুনছে মাঠে চাষী।

তুমি কাজ করো।

আমি কিন্তু
যখনকার কাজ ঠিক তখন না ক'রে—

দাঁড়াব রাস্তার মোড়ে ;
যেখানে বিস্তর লোক একেবারে পৃথক কারণে
এক স্থানে এক কালে জড়ো।
সেখানে আমিই একা অহেতুক ;
ভেবে দেখব মনে মনে
জীবনের এ আবার কোন্ এক রহস্যকৌতুক !

খুব জোর বৃষ্টি আসছে ;
আকাশ মিশকালো।
আলো জ্বালো ;
জানলা-দরজা দাও বন্ধ ক'রে।
বন্ধ শার্সিটার গায়ে
বুনে নাও এই বেলা
খালি হাতে
যত ইচ্ছে আকাশকুসুম।

আমি যাই।
আজ বছরের এই প্রথম মরশুম
গায়ে এসে বিঁধবে যেন বর্শার ফলক
আকাশটা দুখানা করবে
বিদ্যুৎ ঝলক।
নেব না বর্ষাতি কিংবা ছাতা।

আমার স্বভাব নয়, তাই
বাঁচাই না মাথা
—রোদে না, জলে না।

যাই
কিছুক্ষণ গিয়ে বসি
যে-পুকুরে মাছগুলো

জলের গভীরে দিচ্ছে ঘাই।
ফাৎনায় বেঁধানো থাকবে চোখ
পাশে ব'সে থাকবে হয়তো বুড়োমতো লোক—
পরক্ষণে মনে হবে, আরে রাম রাম
লোকটা তো আমারই বয়সী।

ঘেঁষটে ঘেঁষটে যাচ্ছে ট্রাম।
আমাদের গলি দিয়ে যাওয়া এক
বিকলাঙ্গ ভিখিরির মতো
দুর্বিষহ মর্মন্তুদ কর্কশ আওয়াজ।

বিকেলে মিছিল থাকলে আজ
ছোকরাদের সঙ্গে যাব পাল্লা দিয়ে হেঁটে
সারিবদ্ধ দুটো হাত দোলাতে দোলাতে।
পরদিন প'ড়ে নেব, এই যুক্তি এঁটে—
সভায় যা বলা হবে না-শুনে সাক্ষাতে
দল বেঁধে দোকানে চা খাব।

আর যদি সেইসঙ্গে ভাগ্যে যায় জুটে
তবে বাড়ি-গাড়িও হাঁকাব।

ততদিন ঘুরে ঘুরে এ-ফুটে ও-ফুটে
এর ওর তার সঙ্গে
জমাব আলাপ।
হেসে বলব : কী খবর ? কেমন আছেন ?
হাতে খুঁজব হাতের উত্তাপ।

কে হে লোকটা ? এক হাতে বোঁটাসুদ্ধ চুন,
অন্য হাতে কোঁচা ?
যেতে যেতে দিয়ে গেল খোঁচা ?

'কী মশাই, লিখছেন না কেন ?
লিখুন ! লিখুন !'

লোকটার বরাত ভালো।
চলে গেল।
নইলে ও নির্ঘাৎ হত খুন॥

৩

চলেছে রাত্রের ট্রেন,
বাইরে নিকষ অন্ধকার।

জানলা টপকে ছুটে যাচ্ছে উল্টোমুখে
আলোয় কিম্ভূতকিমাকার
মূর্তি সব।
সারা কামরা নিস্তব্ধ নিঝুম।

জেগে একা বসে আছে শিশু—
চোখে নেই ঘুম।
সমানে চলেছে বাইরে
পৈশাচিক কী এক উৎসব।
ডাকলে কেউ উঠবে না সে জানে—
দাদা দিদি কাকা বাবা সব পিপুফিশু।

সে জানে না কোথায় চলেছে
নিয়েছিল এঁচে
মিলছে না কিছুই।

এই অন্ধকার তার ছিল না হিসেবে
স্বপ্নে তার ছিল না স্তব্ধতা।

এই ভয়ংকর ভয়
ডেকে তুলে কাকেই বা দেবে।

শেষ রাত আন্দাজ
হঠাৎ সবাইকে ডেকে তুলে দিল
শূন্যতা ভরাট করা
গুম গুম আওয়াজ।
মা বললেন : ছাখ্, ছাখ্, পদ্মা ঐ দূরে—
সাড়া ব্রিজ এই।
আমরা জয় মা কালী ব'লে
দিলাম সজোরে পয়সা ছুঁড়ে
যে তিমির
সেই তিমিরেই।

তারপর সেই শিশু আবার ঘুমুলো।
স্বপ্নে দেখল : ছাদের যেখানে চাঁদ থাকে
তার পাশে ফণিমনসার টবটাতে
বসে আছে ফের সেই হুলো।

মাকে যেই সে ডাকতে যাবে
মা তার আগেই
ডেকে তাকে ট্রাঙ্কটা খুললেন—

ট্রাঙ্ক থেকে কী বেরুলো বলো।

দুটো তুবড়ি আর দুটো লাল-নীল দেশলাই।
তখন অনেক রাত,
পাড়াসুদ্ধ্, বাড়িসুদ্ধ্, ঘুমোচ্ছে সবাই।

তারপর কী যে মজা হল ॥

৪

সেও এক ব্রিজ-ই
ওপরে টমটম যায় গুড়-গুড় গুড়-গুড়,
নিচে চাও যদি—
হিজিবিজি হিজিবিজি
নদী নৌকো নদী নৌকো নদী।

নাম নওগাঁ ;
অজ মফস্বলে এক নগণ্য শহর।
বৃষ্টিপাত বেশ ক-ইঞ্চি বেশি ,
নেহাত নগণ্য নয়
সেখানকার শীতের বহর।

দু-পাশের রেন্‌ট্রি গাছে ছায়ায় ছায়ায়
দিগন্তের কোন্ অন্তরালে
জানতাম না কোথায় রাস্তা যায়—

কোন্ সে দুবলহাটি, দিঘাপতিয়াই বা কোথায় ?
রান্নাঘরে জানলা দিয়ে দেখা যেত দূরের রাস্তায়
গলায় দুলিয়ে ঘণ্টা হাতি,
দুল্‌কি চালে কখনও বা উট।
দৈনিক সকালে ঠিক কাঁটায় কাঁটায়
রানারের ছুট।

বাইরে বোতামফুল বেল জুঁই, ব্যস্—
ভেতরের ছোট্ট উঠোনে
তুলসীমঞ্চ কাঠগোলাপ হাস্নাহানা দোপাটি টগর
করবী মোরগঝুঁটি ফুল ; তিনটে হাঁস ;
পেঁয়াজ, উচ্ছের মাচা ; লক্ষ্মীগাই থাকত এক কোণে—
দুধ দিলে ডিম পাড়লে যা হত রগড়।

শীতকালে সার্কাস আসত ;
ইস্কুলের মাঠে পড়ত তাঁবু।
কী মুশকিলে পড়তেন যে হারাধনবাবু—
কাছে হবে মনে ক'রে
ছোট্ট তিনফুট উঁচু ঢিবিটায় উঠে তিনি রোজ
আকাশের তারা দেখে দেখে
খাতা ভ'রে কী সব টুকতেন।
সেই ঢিবি একদিন সার্কাসের তাঁবু দিত ঢেকে।

কুড়কুড় কুড়কুড় ক'রে বাজনার বোলে

ঘোড়ার গাড়িটা যেত লাল নীল সবুজ হলুদ
কত কী সুখের পায়রা ওড়াতে ওড়াতে।
আমরা এইটুকুটুকু আধভাঙা খুদ
স্বেচ্ছায় দিতাম ধরা তাদের কবলে।
সারাদিন আমাদের মহানন্দে খুঁটে খুঁটে খেত—

শেষের সপ্তাহে রোজ অন্ত-শেষে-রজনী বুঝিয়ে
সারাটা শহর কানা ক'রে দিয়ে
জানি না কোথায় উড়ে যেত।

পাশের বাড়িতে থাকত আমার যে-বন্ধু, তার এক ছিলেন পিসিমা—
তিনি এলে ঘরে বসত মা-মাসিমাদের আসর
ঝুলিতে গল্পের তাঁর ছিল নাকো সীমা পরিসীমা
জিভে তাঁর কিছুই বাধত না।
কোন্ এক জেলার কোন্ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব
কবে কোন্ ট্রেনের কামরায়—
রসসিক্ত হয়ে উঠত বক্তার রসনা
—মেমকে আদর ক'রে বসালেন কোলে।
ছোটোদের শুনতে নেই—কী হল তারপর

শুনেছি। কারণ, তাতে বিস্কুট ছিল ব'লে।
কামরায় আর যারা ছিল কচর মচর
খেতে লাগল সাহেবের টিন থেকে দামি দামি বিলিতি বিস্কুট।
ছোটোদের দুর্বোধ্য ছিল
মধ্যে মধ্যে থাকত যা ব্যাসকূট।

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে
চিৎপাত হতেন তক্তপোশের ওপর
মা কালী করতেন তাঁকে ভর।
না থেমে গড়গড় ক'রে যা বলতেন তিনি
শুনে সারা গায়ে দিত কাঁটা—

নরকের যত সব ডাকিনী প্রেতিনী
তাঁকে দিচ্ছে সাজা,
বেঁধাচ্ছে গরম লোহা, উপ ড়ে নিচ্ছে চোখ
তেলের কড়াইতে করছে ভাজা—

তাঁর বর্ণনার কাছে
এখনকার পাপবিদ্ধ কবিতা কিছু না।
মনে মনে ওঁর জন্যে ঠাকুরকে ডাকতাম :
হে ঠাকুর, কেন ওঁকে শান্তি দাও না ? কেন ওঁকে করো না করুণা !

সকালে শীতের ভোরে তারের বেড়ায়
ঝুলে ঝুলে থাকত যেন নাকের নোলক।
বিকেল বেলায়
সূর্য ডুবে গেলে করত কী মন কেমন।

ছিল একটা খেলনার ঢোলক
ছেলেমেয়ে একসঙ্গে খেলতাম চত্বরে।
কখনও কখনও খুব নরম হাত ধ'রে

কোনো কিছু না ভেবেই হয়তো বলতাম :
তোর এই আয়মন নাম,
নামের মানেটা কী রে ? আয় মন, আয় মন, নাকি ?
বাঃ, কী সুন্দর গন্ধ,
হাতে বুঝি মেহেদির রং ?

চড়কের আগে আসত সং—
কাছের গ্রামের এক বহুরূপী ; বছরে একবার।
মেস্‌বাড়িতে তার চেয়েও আসত লোক হরেক রকম।
এক আসত শীল্ডে খেলতে নানা জায়গাকার
নামী নামী অনেক প্লেয়ার।
তাদের পা টিপতে গিয়ে আমাদের নিকলে যেত দম।

এক এসেছিল শিল্প-প্রদর্শনী নিয়ে
সরকারের লোক এক ; তারই টেবিলে
কাচের কাগজচাপা দেখে
জীবনে প্রথম সেই কী-যে হয়েছিলাম স্তম্ভিত !
এজন্যে নয় যে, সেটা কাচ।
আসলে কাগজচাপা ব'সে ছিল দিব্যি সেই কাচের মধ্যে গিলে
শ্যামপত্রশোভাসমন্বিত
সম্পূর্ণ একটি গাছ।

আর এসেছিল
বন্যার্ত অঞ্চল থেকে হাতি চ'ড়ে
এক জমিদার, তার দলবলসহ।
সন্ধেবেলা তার ঘরে
বইত রোজ ফুর্তির ফোয়ারা।
দরোজায় পর্দা থাকত,
বাইরে দিত সবন্দুক সেপাই পাহারা।
কালোয়াতি গানের গমক

ঘুঙুরের বোল আর অদৃশ্য ঠমক
উপ্‌চে পড়ত মাঝে মাঝে বাইরের মাঠে।

বন্যা নেমে যাওয়ার ঠিক মুখে—
গিন্নি-মা উঠলেন খাটে
সিঁদুরে চন্দনে রাজরাজেশ্বরী সেজে
কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল আহাম্মক ঝিটাই—

মা, তোমার গৌরবর্ণ নীল হল কিসে!

'কিসে' শুনতে লোকে নাকি শুনেছিল 'বিষে'—
সেই দোষে ঝি হল ছাঁটাই।
ব্যাপারটা সকলেরই নাকি জানা
কিছুই জানি নি আমরা কী বৃত্তান্ত—
ছোটোদের জানবারও কথা না।

খেতালচাষীরা আসত পাট্টা নিতে ;
তখন সামনের মাঠে পা ফেলা যেত না।
ঘটি নিয়ে ঘুরে ঘুরে জল দিতাম আমি আর দাদা।
শুধু শুকনো ঐটুকু পানিকে
কী ক'রে যে মিলে যায় খোদাতালার এত দোয়া
—সেটা ছিল ধাঁধা।
কিছুতে নিতাম না হাতে গুঁজে দিলে কেউ লজেঞ্চুস।

আবগারি-দারোগা হয়ে বাবার যে নামডাক এত—
দাদা বলত, কী জন্যে বল্‌ তো ?
কারণ, নেন না বাবা ঘুষ।
জল দিয়ে লজেঞ্চুস
এক রকম ঘুষ।

কাঁথিতে কোথাও কোনো সমুদ্রের ধারে
নুন তৈরি করতে গিয়ে পুলিশের বুটের কাঁটায়
ঝাঁঝরা হয়েছিল যার পিঠ—
সে এল স্ট্রেচারে।

সমস্ত শহর ক্ষুব্ধ ; ফেটে পড়ছি রাগে
আমরা সবাই।
মাঝে মাঝে হাঁক উঠছে : জোর্‌সে বলো, ভাই—
বন্দে মাতরম্‌।
সারাটা শহর করছে থমথম।
গুপ্তকক্ষে ব'সে ব'সে নিজের অস্থিতে
বজ্র যেন বানাচ্ছে দধীচি।

এমন সময়
হে ধরণী দ্বিধা হও, আমি যাই পাতালে তলিয়ে--
ভিড়ের ভেতর থেকে ও কে বলল : ছি ছি,
তোর বাপ সরকারি চাকুরে!

সন্ধেবেলা একদিন বাপু রে,
মহাকুমা হাকিমের কুঠিতে কী ভিড়—
রেডিও শোনাবে এস্‌-ডি-ওর জামাই।
সকলেই আমন্ত্রিত :
এসেছে সবাই।
মাস্টার, মুন্‌সেফ, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, উকিল, মোক্তার,
সিভিল সার্জেন, সোডাকলের মালিক,
থানার দারোগা, সাব-রেজিস্ট্রার, পশুর ডাক্তার—
সবাই এলেন।
একে এস্‌-ডি-ওর জামাই
তদুপরি শোনাবে রেডিও।
সুতরাং সবাই হাজির

শহরের মশামাছিটিও।

এদিকে সময় যায় বয়ে।
তার, আলো, আলো, তার, এ-কল, সে-কল
এ ছুঁই, তা ছুঁই—
গলদ্‌ঘর্ম এস্-ডি-ওর জামাই বেচারি :
হয় নাকো কিছুতে কিছুই।
শেষকালে শব্দ এল অবিকল
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে অবিকল—
কী কাণ্ড, সমানে ডাকছে একগাদা কুকুর-বেড়াল।
এস্-ডি-ওর থোঁতা মুখ ভোঁতা হতে দেখে
একদল কী খুশী!
এস্-ডি-ওর বরাবরে উকিলরা দিল
সরকারকে দুয়ো।
আরেকজন বলল, ঐ জামাতাটি ভুষি।
শেষের দলটি বলল, এ থেকেই বোঝা যায়
রেডিও ব্যাপারটাই ভুয়ো।

বাঁ-দিকে মার্জিন-টানা বালির কাগজ,
গঁদের আঠার শিশি, চাবি আর তালা,
লাল হলদে সুতোর বাণ্ডিল,
শিলমোহর, গালা
—এই নিয়ে ছিল
বাবার টেবিল।

আর ছিল পেন্সিল কাটার একটা ছুরি।

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি
হৈ হৈ ব্যাপার।

পেন্সিল কাটার সেই ছুরি হাতে, এ কী—

উঠোনে দাঁড়িয়ে মেজো খুড়ি।
বাবার মতলব ছিল নাকি
নিজের গলায় বসাবার।
খাটো ক'রে গলা
'ওতে কি পেন্সিল ছাড়া'—যেই বলা
আর যায় কোথা!
প্রচণ্ড ধমক অমনি : বড্ড হচ্ছ পাকা।

দিদির শাশুড়ি নাকি লিখেছেন যা তা—
দেনাপাওনা এখনও ঢের বাকি।
অথচ দেনার দায়ে
বাবার বিকিয়ে আছে মাথা।

এদিকে চালের মন উঠেছে আট টাকা।

লোকে বলছে
লাগল ব'লে আবার লড়াই॥

৫

লিখি নি, ভাগ্যিস!

মা বলতেন : শুনে নে লিখিস্—

পাল্‌কি এসে পৌঁছল দেউড়িতে
সে পেয়েছে শিবতুল্য বর
বুকের ভেতরে ক'রে আনা
আশা তার মেলে দেবে ডানা—

আলো এল, ঘোমটাও সরালো
কে যেন ককিয়ে উঠল : কালো !
দাঁতে দাঁতে কড়মড় কড়মড়।
সেই থেকে সে রাক্ষসপুরীতে।

ভাগ্যিস, লিখি নি।

নইলে শিব গড়তে গিয়ে
হয়ে যেত নিশ্চয় বাঁদর।

মাকে মনে পড়ে।
মা আমাকে বলতেন বাঁদর।

কিন্তু তবু যখনই বৃষ্টিতে ঝড়ে
চমকাত বিদ্যুৎ
পাশে এসে মা বলতেন হেঁকে :
জয় মণি। স্থির হও।

যে-মন্ত্রে ঘেঁষে না কাছে ভূত
সে-মন্ত্র তো মার কাছেই শেখা।

আজ তাই শ্মশানে মশানে
কৃষ্ণপক্ষে ভয়ংকর যে-কোনো জায়গায়
যেতে পারি একা।

জলে কিংবা ঝড়ে
এখনও মেঘের দিকে যখনই তাকাই
মনে পড়ে মাকে।

কেন মনে পড়ে ?

মা ছিলেন মেঘবর্ণ।
শুধুই কি তাই ?

৬

দুয়ে আর দুয়ে আপনি ঠিক বলছেন চার ?

দেখুন, আমার একটা কুষ্ঠির দরকার।
ভবিষ্যৎটা একটু ভালো ক'রে
জেনে নিতে চাই।
যা যা জানি ব'লে যাচ্ছি
আপনি তো গণক—
ফাঁকগুলো নিজগুণে ভ'রে
বানিয়ে দিন না একটা ছক !

প্রথম যুদ্ধের ঠিক পরে।
কত সাল
সেইটাই তো জানি না।

বার বুধ।

ভুলি নি, কারণ—
মা বলতেন : বুধবারে নখ কাটা
আমার বারণ !

রাশিটা বিচারাধীন।
আপনি রায় দিলে
তবেই চূড়ান্ত ব'লে গণ্য হবে রাশি।
দিদি বলেছিলেন একবার—
যতদূর মনে পড়ছে মীন।

হতেও বা পারে
যে রকম মাছ ভালোবাসি।

মাঘের সংক্রান্তি তিথি।
অকাট্য নির্ভুল।

আরেকটু বলি।
তারপর ইতি।

কী ক'রে জানি না—
আমার মনের মধ্যে জন্মগত ছবি একটা আছে :
একেবারে শীতের শেষদিন।
পাতা নেই গাছে।
দুটি ঠোঁট শব্দ তুলে অন্য দুটি ঠোঁটে
ব'লে ওঠে :
'মনে নেই ? কাল মধুমাস !'

বলেছিল আর কেউ, আমার মা নন।

বললাম তো কারণ—
মা তখন আমাকে নিয়ে যন্ত্রণায় নীল ॥

নাজিম হিক্‌মতের কবিতা

অনুবাদ

অনুবাদ প্রসঙ্গে

নাজিম হিক্‌মতের কবিতার সঙ্গে আমাদের মাত্র অল্পদিনের পরিচয়। ইংরেজি ভাষায় তাঁর যে কয়েকটি কবিতা তর্জমা হয়েছে, শুধু সেই ক'টি পড়েই আমাদের পিপাসা মেটাতে হয়। কিন্তু তাছাড়াও তাঁর যে অসংখ্য কবিতা আছে, যে কয়েকটি মহাকাব্য আছে—মূল তুর্কী ভাষা না জানায় আমরা তার রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত।

বলাবাহুল্য, এ বইতে যে ক'টি কবিতা আমি অনুবাদ করেছি, তার সব প্রায় ইংরেজি থেকে। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হিক্‌মতের একটি কবিতা-সংকলন থেকে কয়েকটি কবিতা অনুবাদের ব্যাপারে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রণজিং গুহের সাহায্য নিয়েছি।

'কলকাতার বাঁড়ুজ্যে', 'আহম্মদ ড্রাইভার' ও 'শেখ বদরুদ্দিনের মহাকাব্য থেকে'—তিনটি পৃথক মহাকাব্যের এককেটি অংশ। 'বাঁড়ুজ্যে' হলেন কলকাতার একজন বিপ্লবী ; তাঁকে নিয়ে হিক্‌মত 'বাঁড়ুজ্যে কেন খুন হলেন' নামে একটি মহাকাব্য লিখেছেন। 'আহাম্মদ ড্রাইভারে'র স্থান তুরস্কের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে। 'শেখ বদরুদ্দিন' তুরস্কের পুরনো যুগের এক গণবিদ্রোহের নায়ক। আদিম সাম্যবাদী সমাজের আদর্শে তিনি ছিলেন অনুপ্রাণিত। সেকালের শাসক শ্রেণীর হাতে তাঁর ফাঁসি হয়। হিক্‌মতের কবিতা অনুবাদ করতে করতে একটা কথা কেবলই মনে হয়েছে—যদি মূল ভাষায় কবিতাগুলো পড়তে পারতাম। বাংলায় তার অনুবাদ তাতে হয়ত আরেকটু যথাযথ হতে পারত। চেষ্টা করেও হিক্‌মতের কবিতার প্রাণবন্ত সুর বজায় রাখতে পারি নি। সভয় শ্রদ্ধায় ছায়ার মত পায়েপায়ে চলবার চেষ্টা করেছি। তাতে বহুক্ষেত্রে নিজেরই জ্ঞাতসারে অনুবাদের মধ্যে আড়ষ্টতা এসেছে। আগাগোড়া কালানুক্রমে কবিতাগুলো সাজানো সম্ভব হয় নি। নামকরণের ব্যাপারে কিছু ব্যতিক্রম করতে হয়েছে। এসব ত্রুটির কথা জেনেশুনেও, আশা করছি, এই অনুবাদ বাঙালী পাঠকের মনে নাজিম হিক্‌মতের কবিতা সম্পর্কে আগ্রহ জাগাবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয় ও পরাজয় আর জীবনের ভালবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব ক'টি দিক। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প, যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না।

কবিতার, গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন—যা বানানো নয়, মিথ্যা নয়, কৃত্রিম নয়; সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর, একান্ত জটিল—অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা। সে ভাষায় উপস্থিত থাকে জীবনের সমস্ত উপাদান। কবি যখন লেখেন আর যখন কথা বলেন কিংবা অস্ত্র হাতে নেন—তিনি একই ব্যক্তি। কবিরা তো ভ্রষ্ট নন যে, তাঁরা মেঘের রাজ্যে পাখা মেলবার স্বপ্ন দেখবেন; কবিরা হলেন সমাজের একজন, —জীবনের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত, জীবনের তাঁরা সংগঠক।

—নাজিম হিক্‌মত

প্রমিথিয়ুসের ডাক

আমাদের হৃদয়ের ঘাড়ে
   তেল-চক্‌চকে
   ঝাঁকড়া চুলের বাবরি নেই।
পেটে আমাদের জায়গা নেই
না গোলাপের, না বুলবুলের, না আত্মার, না চাঁদের আলোর।
নিশ্চিন্তে তোমার স্ত্রীকে
আমাদের জিম্মায় রেখে যেতে পারো।
আমরা আমাদের কল্‌কেয়
দা-কাটা তামাকের মত
পুড়িয়ে দিই
প্রমিথিয়ুসের ডাক।
অগ্নিস্তম্ভের কাঁধে কাঁধ দিয়ে
রক্তিম দিগন্তে আমরা উন্মুখ হয়ে খুঁজি
অগ্নিময় চোখ॥

শয়তানদের জন্যে যেন না মরি

আজ রাত্রে না গেলেও
আগামী কাল রাত্রে
আমি জেলে যাবো।...
আমার অন্তরের একটি পাতাও নড়ছে না
অচৈতন্য ঘুমের মতন আমার মন
শান্ত
নির্বিকার।
আমার মন
শান্ত
নির্বিকার ;
কারণ, নবজাত শিশুর মতন
নীল আকাশ আমি দেখছি।
কাল
শহরের ময়দানে আমি গিয়েছিলাম
হেঁকে বলেছিলাম :
"আমাদের ভাইবন্ধুদের আমরা যেন না মারি
যেন শয়তানদের জন্যে
না মরি॥"

ছাপ

বাতাস
নক্ষত্র
    আর জল···
ঘুম
    কোন আফ্রিকার স্বপ্নে।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আন্দোলিত
    আলোকস্তম্ভের রোশনাই।
আমরা যাই
        আর আসি
এই নক্ষত্রের জগতে
        যেখানে সব কিছু হারায়
      যাকে ছাড়া কিছুরই মুখোশ খোলে না।···
নক্ষত্র
    জলবক্ষে
বাতাস
    কল্লোলিত তরঙ্গরাশি।···
দীর্ঘকাল
    আমি এখানে
কেউ গান গাইছে···

        জলকল্লোলের মত
        নক্ষত্রের মত
        বাতাসের মত।···
মিশ্‌কালো রাত্রি
        উজানী নৌকার মত॥

না-ধরানো সিগারেট

আজ রাত্রেই সম্ভবত তার মৃত্যু
তার কামিজটার বুকে দগ্ধ এক বুলেট
আজ রাত্রেই সে গেছে মরবার জন্যে
—সিগারেট আছে ? হাত বাড়িয়ে সে বলেছিল…
আমি বলেছিলাম—আছে।
—দেশলাই ?
বলেছিলাম—নেই।
বুলেটের আগুনে ধরিও।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে সে চলে গেল।
হয়ত এখন সে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে ঘুমোচ্ছে
ঠোঁটে তার না-ধরানো সিগারেট
বক্ষস্থলে ক্ষত।
সে নেই।
শুধু একটা ঢ্যারা চিহ্ন।
সব শেষ।…

কলকাতার বাঁড়ুজ্যে

চোখে আমার সোনার ফোঁটার মত আলো-ফেলা
এই নক্ষত্র
যখন প্রথম বিদীর্ণ করেছিল
শূন্যতার
এই অন্ধকার
এই পৃথিবীতে তখন আকাশের দিকে উন্মুখ
একটি চোখও ছিল না।...
নক্ষত্রেরা তখন প্রাচীন,
পৃথিবী নেহাত শিশু।

নক্ষত্রেরা দূরে
আমাদের কাছ থেকে
অনেক, অনেক দূরে।...
আর তাদের মাঝখানে কী ক্ষুদ্র আমাদের এই পৃথিবী
একটি কণিকা মাত্র
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি বিন্দু।...

পৃথিবীকে পাঁচ টুকরো করলে তার এক টুকরো
এশিয়া
এশিয়ার অনেক দেশের একটি দেশ
ভারতবর্ষ,
ভারতবর্ষের অনেক শহরের একটি শহর
কলকাতা,
সেই কলকাতার একটি মানুষ
বাঁড়ুজ্যে।

আমার কাছে তোমরা শোনো এই খবর :
ভারতবর্ষ ভূখণ্ডে

শহর কলকাতায়
একটি মানুষের গতিবিধি আজ রুদ্ধ
ওরা শিকল পরিয়েছে এক অভিযাত্রী মানুষের পায়ে।

উজ্জ্বল আকাশের দিকে
আর আমার মুখ তোলবার বাসনা নেই।
নক্ষত্রেরা যদি দূরে থাকে থাকুক
পৃথিবী যদি ক্ষুদ্র হয় হোক
ও সব তুচ্ছ
কি তাতে যায় আসে।…
আমি তোমাদের জানাতে চাই

আমার কাছে
তার চেয়েও বিস্ময়কর
তার চেয়েও শক্তিমান
তার চেয়েও রহস্যময়
গতিরুদ্ধ
শৃঙ্খলিত
সেই মানুষ

বিদায়

বিদায়
আমার বন্ধুরা
বিদায়!

আমার হৃদয়ে
আমি তোমাদের নিয়ে চললাম
আমার গভীর হৃদয়ে
নিয়ে চললাম আমার অন্তরের সংগ্রামে।
বিদায়
আমার বন্ধুরা
বিদায়!

জলছবির পাখিদের মত
বন্দরে দাঁড়িয়ে তোমরা
বিদায় জানাতে এসো না
আমি চাই না।
মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত
আমার বন্ধুদের চোখে আমি নিজেকে দেখি
বন্ধুরা আমার
সহযোদ্ধা আমার
কাজের সাথীরা আমার
কমরেড
নীরব আমাদের বিদায়।
রাত্রিরা কুলুপ লাগাবে দরজায়
বছরগুলো জাল বুনবে জানলায়
আর আমি হেঁকে উঠব জেলখানার গান
দুন্দুভির মত।

আবার আমরা মিলব,
   আমার বন্ধুরা,
      আবার আমরা মিলব
হাতে হাত মিলিয়ে সূর্যকে দেখে হাসব
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব
হে আমার বন্ধুরা
   সহযোদ্ধা আমার
      কাজের সাথীরা আমার
         কমরেড
            বিদায় ॥

শেখ বদরুদ্দিনের মহাকাব্য থেকে

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
চম্‌কানো
চাপা গলায়
যেন রাজদ্রোহের আলাপ।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
যেন কোন বেইমানের ফ্যাকাসে উলঙ্গ পা
স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার মাটিতে ধাবমান।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
সেরেজের বাজারে
কাঁসারীর ঝাঁপের সামনে
একটি গাছে ঝুলছে বদরুদ্দিন আমার।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
নক্ষত্রহীন এই নিশুতি রাত্রে
বৃষ্টিতে ভিজছে
নিষ্পত্র গাছের ডালে আমার শেখের উলঙ্গ শরীর।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।
সেরেজের বাজার মূক
সেরেজের বাজার অন্ধ।
হাওয়ায় নৈঃশব্দ্যের, হাওয়ায় অন্ধতার শাপগ্রস্ত বিষাদ
সেরেজের বাজার হাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি॥

রবিবার

আজ রবিবার
আজ এই প্রথম
রোদ্দুরে আমাকে বেরোতে দিয়েছে ওরা
আর জীবনে এই প্রথম
দেখে অবাক হলাম আকাশ কত সুদূর
কত নীল
কত বিরাট।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে।
তারপর অবাক বিস্ময় নিয়ে মাটিতে বসলাম।
সাদা দেয়ালে এলিয়ে দিলাম পিঠ।
ঠিক এই মুহূর্তে কোন অলস স্বপ্ন নয়

বধূ নয়, সংগ্রাম নয়, স্বাধীনতা নয়।
পৃথিবী, সূর্য আর আমি।…

আমি আনন্দিত, আমি সুখী॥

আহম্মদ ড্রাইভার

কী বলছিলাম আমরা, আহম্মদ, বাছা আমার!
ঢালাইয়ের দোকানগুলো ডানদিকে রেখে
বড়বাজারের দিকে তুমি মোড় নিলে
বাঁদিকের চৌমাথায় বইয়ের দোকান :
স্ফটিক প্রাসাদের কাহিনী
জেভ্‌দেতের ছ'খণ্ড ইতিহাস
আর "পাকশালার শিল্প"…

পাকশালা মানে রান্নাঘর
অর্থাৎ, খানা পাকানো।
আমি ভালবাসতাম পুর দেওয়া সেই পাটিসাপটা
সোনালি একটা ধার অনায়াসে ধ'রে
একগুচ্ছ আঙুরের মত যা তুমি মুখে ফেলতে পারো।

আমাদের আগে আগে চলেছে একদল ঘোড়সওয়ার
এই তারা বাঁয়ে ঘুরলো…
সোজা বড়বাজারে নেমে যাও
ছুতোরমিস্ত্রি, স্যাকরা,
মালাকার…
তুমি হ'লে ইস্তানবুলের ছেলে

নিজে হাতের কাজে ওস্তাদ
তাই ইস্তানবুলের কারিগরদের দিকে তাকিয়ে তুমি মুগ্ধ
তুমি বললে
কী সূক্ষ্ম, কী বিচিত্র তাদের হাতের কাজ।
রুস্তম পাশার মসজিদ,
তার গায়ে রশির দোকান
শ'য়ে শ'য়ে উজানী নৌকো
আর মরুচারী অসংখ্য খচ্চরের জন্যে
রশির দোকানে তারা বেচে
রাশীকৃত দড়ি, সুতো আর ব্রোঞ্জ-গলানো ঘণ্টা।

জেলের ফটক,
মোল্লা জাফের,
দূরে মেছোহাট,
আর মেওয়ার কারবারী···
ফলের জেটির কাছাকাছি আমরা।

নৌকো আর সাদা পালে
রোদে-ঝল্‌সানো তরমুজের খোসায়
সনাক্ত সেই সমুদ্রের জন্যে আমি উন্মুখ।

পেছনে বাঁদিকের টায়ার ফুটো হ'ল কি?
নেমে দেখি···

একবার ফলের জেটি থেকে ঢিকিয়ে-চলা বজ্‌রায়
আমরা গিয়েছিলাম ইয়ুপের কল্পতরু কূপে।
হাত দুটো তার ছোট্ট আর গোলগাল
আর তার পা দুটো ঈষৎ বাঁকা
কিন্তু চোখ জোড়া তার সবুজ জলপাইয়ের মত
আর অর্ধচন্দ্রের মত বাঁকানো তার ভুরু

গলায় সাদা ওড়না জড়ানো
রুস্তম পাশার মসজিদে যেই এলাম…
ফুটো চাকা থেকে হাওয়া বেরোচ্ছে ;
যদি এই মুস্কিলের কোন আশান না হয়…
চলো দেখা করি মোল্লা জাফেরের সঙ্গে।

তিন নম্বর ট্রাক গেল থেমে।
অন্ধকার,
জ্যাক্,
পাম্প,
হাত,
তার শাপান্তকারী হাত, ক্রুদ্ধ কারণ শাপান্ত করতে হচ্ছে।
টায়ার আর পুরনো চাকা ঠিক করতে করতে
আহম্মদের মনে পড়ল :
এক রাত্রে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত নানীকে
এক চৌকি থেকে অন্য চৌকিতে
বেচারা নানী…

ভেতরকার টিউব্‌টা ফেটে চৌচির
ফাল্‌তু কোন
টায়ার নেই।
নির্জন পাহাড়ে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকবে ?
স্থলেমানি থেকে তুমি এসেছো, আহম্মদ, বাছা আমার।
তিন নম্বর এই ট্রাকের ভার দিয়েছে একা তোমায়।
আর মনে করো সেই ভেড়ার কথা
নিজের ঠ্যাঙে জড়িয়ে যাকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল।
স্থলেমানির ড্রাইভার আহম্মদ, খুলে ফেল তোমার জামাকাপড়।
বিবস্ত্র হ'ল সে
কোট, পাজামা, জাঙিয়া, শার্ট, লাল চাদর

শুধু আহম্মদের পায়ের জুতো জোড়া ছাড়া সব কিছুই
টায়ারের পেটে গিয়ে
পেট উঁচু হ'ল।

এ এক ধ্রুপদী আলাপ।
বন্দরের গায়ে শহর
তার সাদা ওড়না।...

ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে চলেছি।
পুরনো ট্রাক সামলে ভাই,
সামলে চলো যেন পাহাড়গুলো দেখতে পায়
উলঙ্গ দিগম্বর আহম্মদকে।

হে আমার সিংহ-হৃদয়! সামলে চলো
কোন মানুষ
কোন যন্ত্রকে
কোনদিন এত ব্যাকুল আশা নিয়ে
ভালবাসে নি॥

জেলখানার চিঠি

প্রিয়তমা আমার
তোমার শেষ চিঠিতে
      তুমি লিখেছো :
মাথা আমার ব্যথায় টন্‌টন্ করছে
      দিশেহারা আমার হৃদয়।
      তুমি লিখেছো :
যদি ওরা তোমাকে ফাঁসী দেয়
      তোমাকে যদি হারাই
            আমি বাঁচব না।

তুমি বেঁচে থাকবে, প্রিয়তমা বধূ আমার
আমার স্মৃতি কালো ধোঁয়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে
তুমি বেঁচে থাকবে, আমার হৃদয়ের রক্তকেশী ভগিনী,
বিংশ শতাব্দীতে
      মানুষের শোকের আয়ু
            বড় জোর এক বছর।
মৃত্যু...
দড়ির এক প্রান্তে দোদুল্যমান শবদেহ
আমার কাম্য নয় সেই মৃত্যু।
কিন্তু প্রিয়তমা আমার, তুমি জেনো
      জল্লাদের লোমশ হাত
            যদি আমার গলায়
                  ফাঁসীর দড়ি পরায়
নাজিমের নীল চোখে
      ওরা বৃথাই খুঁজে ফিরবে
                  ভয়।
অন্তিম উষার অস্ফুট আলোয়
আমি দেখব আমার বন্ধুদের, তোমাকে দেখব

আমার সঙ্গে কবরে যাবে
      শুধু আমার
         এক অসমাপ্ত গানের বেদনা।

২

বধু আমার,
তুমি আমার কোমল প্রাণ মৌমাছি
চোখ তোমার মধুর চেয়েও মিষ্টি।
কেন তোমাকে আমি লিখতে গেলাম
      ওরা আমাকে ফাঁসী দিতে চায়
বিচার সবে মাত্র শুরু হয়েছে
আর মানুষের মুণ্ডুটা তো বোঁটার ফুল নয়
      ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে নেবে।

ও নিয়ে ভেবো না
ওসব বহু দূরের ভাবনা
হাতে যদি টাকা থাকে
      আমার জন্যে কিনে পাঠিও গরম একটা পা জামা
পায়ে আমার বাত ধরেছে।
      ভুলে যেও না
স্বামী যার জেলখানায়
      তার মনে যেন সব সময় ফুর্তি থাকে।

বাতাস আসে, বাতাস যায়
      চেরীর একই ডাল একই ঝড়ে
         দুবার দোলে না।
গাছে গাছে পাখির কাকলি
পাখাগুলো উড়তে চায়।

জান্‌লা বন্ধ :
　　টান মেরে খুলতে হবে।

আমি তোমাকে চাই :
তোমার মতই রমণীয় হ'ক জীবন
আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তমার মত।...

আমি জানি, দুঃখের ডালি
　　আজও উজাড় হয় নি
কিন্তু একদিন হবে।

৩

নতজানু হয়ে আমি চেয়ে আছি মাটির দিকে
উজ্জ্বল নীল ফুলের মঞ্জরিত শাখার দিকে আমি তাকিয়ে
তুমি যেন মৃন্ময়ী বসন্ত, আমার প্রিয়তমা
　　আমি তোমার দিকে তাকিয়ে।

মাটিতে পিঠ রেখে আমি দেখি আকাশকে
তুমি যেন মধুমাস, তুমি আকাশ
　　আমি তোমাকে দেখছি, প্রিয়তমা।

রাত্রির অন্ধকারে, গ্রামদেশে শুকনো পাতায় আমি জ্বালিয়েছিলাম আগুন
　　আমি স্পর্শ করছি সেই আগুন
নক্ষত্রের নিচে জ্বালা অগ্নিকুণ্ডের মত তুমি
　　আমার প্রিয়তমা, তোমাকে স্পর্শ করছি।

আমি আছি মানুষের মাঝখানে, ভালবাসি আমি মানুষকে
ভালবাসি আন্দোলন,
ভালবাসি চিন্তা করতে,

আমার সংগ্রামকে আমি ভালবাসি
আমার সংগ্রামের অন্তস্তলে মানুষের আসনে তুমি আসীন
প্রিয়তমা আমার, আমি তোমাকে ভালবাসি।

৪

রাত এখন ন'টা
ঘণ্টা বেজে গেছে গুমটিতে
সেলের দরোজা তালাবন্ধ হবে এক্ষুনি।
এবার জেলখানায় একটু বেশী দিন কাটল
আট্টা বছর।

বেঁচে থাকায় অনেক আশা, প্রিয়তমা
তোমাকে ভালবাসার মতই একাগ্র বেঁচে থাকা।
কী মধুর, কী আশায় রঙীন তোমার স্মৃতি।...
কিন্তু আর আমি আশায় তুষ্ট নই,
আমি আর শুনতে চাই না গান
আমার নিজের গান এবার আমি গাইব।

আমাদের ছেলেটা বিছানায় শয্যাগত
বাপ তার জেলখানায়
তোমার ভারাক্রান্ত মাথাটা ক্লান্ত হাতের ওপর এলানো
আমরা আর আমাদের এই পৃথিবী একই সূচ্যগ্রে দাঁড়িয়ে।
দুঃসময় থেকে সুসময়ে
মানুষ পৌছে দেবে মানুষকে
আমাদের ছেলেটা নিরাময় হয়ে উঠবে
তার বাপ খালাস পাবে জেল থেকে
তোমার সোনালী চোখে উপচে পড়বে হাসি
আমরা আর আমাদের এই পৃথিবী একই সূচ্যগ্রে।

৫

যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর
তা আজও আমরা দেখি নি।
সব থেকে সুন্দর শিশু
　　আজও বেড়ে ওঠে নি।
আমাদের সব থেকে সুন্দর দিনগুলো
　　আজও আমরা পাই নি।
মধুরতম যে-কথা আমি বলতে চাই
সে কথা আজও আমি বলি নি।

৬

কাল রাত্রে তোমাকে আমি স্বপ্ন দেখলাম
মাথা উঁচু ক'রে
ধূসর চোখ তুলে তুমি আছো আমার দিকে তাকিয়ে
তোমার আর্দ্র ওষ্ঠাধর কম্পমান
　　কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না।

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে কোথাও আনন্দ সংবাদের মত ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ
বাতাসে গুন্‌গুন্ করছে মহাকাল
আমার ক্যানারীর লাল খাঁচায়
গানের একটি কলি,
লাঙল-চষা ভুঁইতে
মাটির বুক ফুঁড়ে উদ্গত অঙ্কুরের দুরন্ত কলরব
আর এক মহিমান্বিত জনতার ব্রজকণ্ঠে উচ্চারিত ন্যায্য অধিকার
তোমার আর্দ্র ওষ্ঠাধর কম্পমান
　　কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না।

আশাভঙ্গে অভিশাপ নিয়ে জেগে উঠলাম।
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বইতে মুখ রেখে।
অতগুলো কণ্ঠস্বরের মধ্যে
তোমার স্বরও কি আমি শুনতে পাই নি ?

হয়ত

হয়ত আমি
      সেই দিনের
            ঢের আগেই
সাঁকোটার এক প্রান্তে ঝুলতে ঝুলতে
নিচের বাঁধানো সড়কে আমার ছায়া ফেলব

হয়ত আমি
      সেই দিনের
            অনেক পরে
পরিষ্কার কামানো চিবুকে পাকা দাড়ির আভাস নিয়ে
            তখনও বেঁচে থাকব

আর আমি
      সেই দিনের অনেক পরেও
                  যদি বেঁচে থাকি
শহরের এ-পার্কে ও-পার্কে
      পাঁচিলে হেলান দিয়ে
ছুটির দিন সন্ধে হলেই বেহালায় সুর ভাঁজব
সেই বুড়ো লেকগুলোর জন্যে, যারা আমাদেরই মত
      শেষ লড়াই ফতে ক'রে টিকে আছে

আমাদের ঘিরে অবাক রাত্রের আলোকিত ফুটপাথ
আর নতুন গানে মুখর নতুন মানুষের পদচিহ্ন ॥

আমি জেলে যাবার পর

জেলে এলাম সেই কবে
তারপর দশবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী।
পৃথিবীকে যদি বলো, সে বলবে—
"কিছুই নয়,
অণুমাত্র কাল।"
আমি ব'লব—
"আমার জীবনের দশটা বছর।"

যে বছর জেলে এলাম
একটা পেন্সিল ছিল
লিখে লিখে ক্ষইয়ে ফেলাতে এক হপ্তাও লাগে নি।
পেন্সিলকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে :
"একটা গোটা জীবন।"
আমি ব'লব :
"এমন আর কী, একটা মাত্র সপ্তাহ।"

যখন জেলে গেলাম
খুনের আসামী ওসমান
কিছুকাল ছাড়া পেল
তারপর চোরাই চালানের দায়ে
ঘুরে এসে ছ'মাস কয়েদ খেটে আবার খালাস হ'ল
কাল তার চিঠি পেলাম বিয়ে হয়েছে তার
আগামী বসন্তে ছেলের মুখ দেখবে।

আমি জেলে আসবার সময়
যে সন্তানেরা জননীর গর্ভে ছিল
আজ তারা দশ বছরের বালক।
সেদিনকার রোগা ঠ্যাং-লম্বা ঘোড়ার বাচ্চাগুলো
বেশ কিছুদিন হ'ল রীতিমত নিতম্বিনী ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে।
কিন্তু জলপাইয়ের জঙ্গল আজও সেই জঙ্গল
আজও তারা তেমনি শিশু।
আমি জেলে যাবার পর
দূরবর্তী আমার শহরে জেগেছে নতুন নতুন পার্ক
আর আমার বাড়ির লোকগুলো
এখন উঠে গেছে অচেনা রাস্তায়
যে বাড়ি আমি কখনো চোখেও দেখি নি।

যে বছর আমি জেলে এসেছিলাম
রুটি ছিল তুলোর মত সাদা
তারপর এই রেশনের যুগ
এখানে এই জেলখানায়
লোকগুলো মুঠিভর রুটির জন্যে হন্যে হ'ল
আজ আবার অবাধে কিনতে পারো
কিন্তু কালো বিস্বাদ সেই রুটি।

যে বছর আমি জেলে এলাম
দ্বিতীয় যুদ্ধের সবে শুরু
দাচাউ-এর শ্মশান-চুল্লী তখন জ্বলে নি
তখনও অ্যাটম বোমা পড়ে নি হিরোশিমায়।
টুঁটি-টেপা শিশুর রক্তের মত সময় বয়ে গেল
তারপর সমাপ্ত সেই অধ্যায়
আজ মার্কিন ডলারে শোনো তৃতীয় মহাযুদ্ধের বোল।

কিন্তু আমি জেলে যাবার পর
আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে দিন।
আর অন্ধকারের কিনার থেকে
ফুটপাথে তাদের ভারী হাতের ভর দিয়ে
তারা অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমি জেলে যাবার পর
সূর্যকে দশবার প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী
আর আমি বারম্বার সেই একই কথা বলছি
জেলখানায় কাটানো দশটা বছরে
যা লিখেছি সব তাদেরই জন্যে

তাদেরই জন্যে, যারা মাটির পিঁপড়ের মত
সমুদ্রের মাছের মত, আকাশের পাখির মত অগণিত,
যারা ভীরু, যারা বীর
যারা নিরক্ষর, যারা শিক্ষিত
যারা শিশুর মত সরল
যারা ধ্বংস করে
যারা সৃষ্টি করে
কেবল তাদেরই জীবনবৃত্তান্ত মুখর আমার গানে।
আর যা কিছু
—ধরো, আমার জেলের দশটা বছর—
শুধুমাত্র কথার কথা॥

ক্ষমা করব না

তোমার বীভৎস হাত দুটো ক্ষতের ওপর চাপা
যতক্ষণ না রক্ত বার হয়
দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাম্‌ড়ে
দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করো।
এখন আশা বলতে শুধুমাত্র
একটা কর্কশ চীৎকার।
দাঁত আর নখ দিয়ে
ছিনিয়ে নিতে হবে জয়
আমরা কিছুই ক্ষমা করবো না।

দিনগুলি মেঘাচ্ছন্ন
মৃত্যুর খবর দিচ্ছে দিনগুলি
দুশমনেরা নিষ্ঠুর
হৃদয়হীন শয়তান।
লড়াইতে প্রাণ দিচ্ছে আমাদের লোকগুলো
—অথচ বাঁচবার কথা তাদেরই—
আমাদের লোকগুলো মরছে
—কাতারে কাতারে—
যেন গান আর পতাকা নিয়ে
ছুটির দিনে তারা মিছিলে বেরিয়েছে
কী অল্প বয়েস
কী বেপরোয়া…

দিনগুলি মেঘাচ্ছন্ন
মৃত্যুর খবর দিচ্ছে দিনগুলি।
নিজের হাতে আমরা সুন্দরতম পৃথিবীগুলোকে পুড়িয়েছি
কেঁদে কেঁদে চোখে আর কান্না নেই

আমাদের খানিক বিষণ্ণ, খানিক রুক্ষ ক'রে রেখে
    চোখের জল শুকিয়েছে।
তাই আমরা ভুলে গিয়েছি
কেমন ক'রে ক্ষমা করতে হয়
রক্তের নদী উজিয়ে
আমাদের নিশানা
দাঁত আর নখ দিয়ে
    ছিনিয়ে নিতে হবে জয়
কিছুই আমরা ক্ষমা করব না ॥

বিংশ শতাব্দী

"চলো ঘুমনো যাক, প্রিয় আমার
    ওঠা যাবে আবার একশো বছর পরে।..."
"না
আমি বেইমান নই,
এ শতাব্দী আমার বিভীষিকা নয়।
ছন্নছাড়া আমার শতাব্দী
        লজ্জায় আরক্তিম
দৃপ্ত আমার এই শতাব্দী
        মহিমান্বিত
        মহারথী।
বড় বেশী আগে জন্মেছি ব'লে কখনও বিলাপ করি নি
আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ
আমার গর্ব
আমি এখানে আছি,
আমার দেশের মানুষের মাঝখানে

নতুন পৃথিবীর মুখচেয়ে আমি লড়ছি
আবার কি চাই…”
“একশো বছর পর, প্রিয় আমার”…

“না,
বেশী দেরি নেই
সব কিছু সত্ত্বেও
আমার শতাব্দী প্রতি মুহূর্তে মরে গিয়ে আবার নতুন জন্ম নিচ্ছে
আমার শতাব্দীর অন্তিম দিনগুলো বড় সুন্দর হবে
আমার শতাব্দী সূর্যালোকে ঠিক্‌রে পড়বে, আমার প্রিয়,
ঠিক তোমার চোখের মত ॥”

তুমি আমি

আমরা একটি আপেলের আধখানা
বাকি আধখানা আমাদের এই বিরাট পৃথিবী
আমরা একটি আপেলের আধখানা
বাকি আধখানা অগণিত মানুষ
তুমি একটি আপেলের আধখানা
বাকি আধখানা আমি
তুমি আর আমি ॥

ভুখ হরতালের পাঁচ দিনের দিন

যে কথা আমি বলছি
যদি নিজে গিয়ে তোমাদের বলতে না পারি
ভাই,
তোমরা আমার দোষ নিও না।
চুলে আমার পাক ধরেছে, মাথাও একটু টলছে
নেশায় নয়
এই এতটুকু একটু ক্ষিধেয়।

ভাই,
তোমরা যারা ইউরোপের, যারা এশিয়ার, যারা আমেরিকার
আমি জেলেও নই, ভুখ হরতালীও আমি নই
আজ এই মে মাসে, আমি ঘাসের ওপর শুয়ে—এখন রাত্রি
আমার শিয়রের কাছে তোমাদের চোখ নক্ষত্রের মত জ্বল্‌ছে
আমার মুঠোয় তোমাদের হাত
  যেন আমার জননীর
  যেন আমার প্রিয়তমার
  যেন জীবনের।

আমার ভাই,
তোমরা দূরে থেকেও আমাকে কখনও ছেড়ে যাও নি।
না আমাকে, না আমার দেশকে, না আমার দেশের মানুষগুলোকে।
আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি
  তেমনি তোমরাও আমার যা কিছু আপন তাকে ভালবাসো।
  আমার ধন্যবাদ নাও, ভাই, ধন্যবাদ।

ভাই,
আমি মরতে চাই না।

যদি আমি খুন হই
তবু তোমাদের মধ্যে বেঁচে থাকব, আমি জানি।
আরাগঁর কবিতায় আমি থাকব
—যে কবিতায় মধুর আগামী দিনের স্তবগাথা।

আমি থাকবো পিকাসোর শ্বেতকপোতে
রোবসনের গানের মধ্যে আমি থাকব
থাকব সমস্ত চরাচর জুড়ে
আরও রমণীয় হয়ে।
সহযোদ্ধার বিজয়ী হাসির মধ্যে আমি থাকব
থাকব মার্সাইয়ের ডক মজুরদের মধ্যে।
অকপটে আমি বলছি, ভাই
আমি সুখী, নববধুর মত সুখী॥

দুশমন

ওরা দুশমন বার্সার জোলা রেজেপের
দুশমন ওরা কারাবুক কারখানার ফিটার মিস্ত্রী হাসানের।
ওরা দুশমন গরীব চাষী মেয়ে হাট্‌চে-র
দুশমন ওরা ক্ষেতমজুর সুলেমানের।
ওরা তোমার দুশমন, আমার দুশমন
প্রত্যেক বুঝদার মানুষেরই ওরা দুশমন।
আমাদের পিতৃভূমি—এই সব লোক যার বাসিন্দা
ওরা, প্রিয়তমা আমার, আমাদের পিতৃভূমির শত্রু।

ওরা আশার দুশমন, প্রিয়তমা আমার,
স্রোতের জলের

ফলভারাবনত গাছের
প্রসারিত উন্নত জীবনের ওরা দুশমন।

ওদের ললাটে মৃত্যুর চাপ্‌রাশ
—ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত, গ'লে পড়া দেহ
ওরা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে,
যাবে আর আসবে না।

প্রিয়তমা আমার, নিশ্চয় জেনো
এই সুন্দর দেশে
স্বাধীনতা মনের সুখে চলবে ফিরবে,
জমকালো পোশাক গায়ে দিয়ে
মজুরের পোশাক প'রে হাঁটবে॥

তুমি আমার দেশ

তুমি মাঠ
    আমি ট্র্যাক্টর
তুমি কাগজ
    আমি টাইপ-রাইটার
বধূ আমার
    আমার সন্তানের জননী
        তুমি গান
            আমি গীটার

আমি সিক্তপ্রায়, উষ্ণ, ঝড়ো-হাওয়ার সন্ধ্যা
বন্দরে ভ্রাম্যমাণ তুমি নারী
বাতি-জ্বলা ওপারে তোমার দৃষ্টি।

আমি জল
অঞ্জলি ভ'রে তুমিই তা পান করো।
আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই
জান্‌লা খুলে তুমিই আমাকে ডাকো।

তুমি চীন
আমি মাও সে-তুঙের বাহিনী।
তুমি ফিলিপাইনের চতুর্দশী বালিকা
এক মার্কিন খালাসীর কবল থেকে
আমি তোমাকে রক্ষা করছি।
এক পাহাড়ের চূড়ায় তুমি আনাতোলিয়ার একটি গ্রাম
তুমি আমার সব থেকে রূপবতী মহিমান্বিত নগরী
তুমি আর্ত চীৎকার,
তুমি আমার দেশ।
যে পদচিহ্ন তোমাকে খুঁজছে,
সে তো আমারই॥

পল রোবসন-কে

ওরা আমাদের গাইতে দেয় না, রোবসন,
ঈগল গায়ক, নিগ্রো ভাই আমার,
আমরা আমাদের গান গাই ওরা চায় না।

ওরা ভয় পেয়েছে, রোবসন,
ভয় রাত্রিপ্রভাতের, ভয় রূপের
ভয় শব্দের, ভয় স্পর্শের।
ওদের আতঙ্ক ভালবাসায়
যেমন ক'রে ভালবেসেছিল ফরহাদ।
(তোমাদেরও ফরহাদের মত কেউ আছে নিশ্চয়, রোবসন,
কি নাম তার ?)

ওদের আতঙ্ক বীজ আর মাটি
স্রোতের জল আর কোন বন্ধুর হাতের স্মৃতি
যা চায় না কোন বাটা, কোন দস্তুরী, কোন সুদ
যে হাত তাদের মণিবন্ধে দুদণ্ড পাখির মত কোনদিন বসে নি।

ওরা ভয় পেয়েছে, নিগ্রো ভাই আমার,
আমাদের গান ওদের আতঙ্ক, রোবসন॥

আমার হৃদয়

আমার হৃদয়ের আধখানা এখানে, ডাক্তার
বাকি আধখানা চীনে
পীত নদীর স্রোতে নামা সেনাবাহিনীতে।
প্রত্যহ সকাল বেলায়, ডাক্তার
প্রত্যহ ভোরে
গুলীবিদ্ধ হচ্ছে আমার হৃদয়
গ্রীসে।
যখন বন্দীরা ঘুমোয়
শেষ পদশব্দ যখন মিলিয়ে যায় হাসপাতালে
ডাক্তার, আমার হৃদয় তাদের সঙ্গে যায়।
ইস্তানবুলে, আমার সাবেকের জংলী বাসায়
হৃদয় আমার ছুটে যায়।
তারপর এই দশটা বছর, ডাক্তার
আমি কপর্দকহীন, আমি রিক্ত ;
গরীব দেশবাসীকে কী দেবো ?
দিতে পারি শুধু একটা আপেল
লাল একটা আপেল—আমার হৃদয়।
আর কোন কারণ নয়
—না চোখের ছানি, না নিকোটিন, না জেলখানা
শুধু এই একটি কারণেই
ধড়ফড় করে আমার রোগে-ধরা বুক।
আমি দেখি গরাদ ডিঙিয়ে রাত অতিক্রান্ত হয়
যদিও আমার বুকে পাষাণ চাপায় চারিদিকের দেয়াল
তবু দূরতম নক্ষত্রের তালে তাল দিয়ে
স্পন্দমান আমার হৃদয় ॥

সকাল

আমি জেগে উঠলাম।
তুমি কোথায় ?
তোমার নিজের ঘরে।
নিজের ঘরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে
এখনও অভ্যস্ত হ'তে পারো নি!
তেরো বছর জেলে থাকবার
এই হচ্ছে বিশ্রী হাল।

তোমার পাশে কে শুয়ে ?
দেবশিশুর মত গভীর ঘুমে অচেতন।
একাকিত্ব নয়, তোমার স্ত্রী
সন্তানসম্ভবা নারী।

ক'টা বাজে এখন ?
সকাল আট্‌টা
তাহলে সন্ধ্যে পর্যন্ত তুমি নিরাপদ
কারণ, দিনের বেলায়
পুলিশেরা সচরাচর
বাড়িতে হানা দেয় না॥

বিকেলের হাওয়ায়

এখন তুমি জেলখানার বাইরে।
তুমি ছাড়া পাবার পরই
সন্তানসম্ভবা তোমার স্ত্রী।

বাহুতে বাহু মিলিয়ে
কাছেই বেরোলে তোমরা বিকেলের হাওয়ায়।
নাকের দিকে ঠেলে উঠেছে পেট
পবিত্র ভার বহনের কী মধুর ভঙ্গিমা।
বাতাস ঠাণ্ডা
শীত-লাগা শিশুর হাতের মত ঠাণ্ডা
দুই হাতের তালুর উষ্ণতায় তুমি তাকে চাইছ
উত্তাপ দিতে।

পাড়ার বেড়ালগুলো ভিড় করেছে কশাইয়ের দরজায়
চুলে সযত্নে পাতা কেটে তার বউ ওপরতলায় দাঁড়িয়ে
জান্‌লার ঝন্‌কাঠে তার স্তনযুগ
ঘনায়মান সন্ধ্যাকে সে দেখছে।

আধো-ছায়া আধো-আলো আকাশে মেঘ নেই
ঠিক মাঝখানে জল্‌জল্‌ করছে সন্ধ্যাতারা
টলটলে এক গ্লাস জলের মত ঝক্‌ঝকে।
এবার নিদাঘ বড় দীর্ঘ
মাল্‌বেরির গাছ হলুদবর্ণ হলেও
ডুমুর ফল এখনও সবুজ।
ছাপাখানার কারিগর শাহাপ, আর গয়লা ইয়ানির ছোট মেয়েটা
আঙুলে আঙুল জড়িয়ে
এখন বেড়াতে গেছে বিকেলের হাওয়ায়॥

কারাবেতের মুদিখানায় জলেছে সন্ধ্যে।
আজও ক্ষমা করে নি এই আর্মেনী লোকটি
কুর্দি পাহাড়ে তার খুন হওয়া বাপের আততায়ীদের।
কিন্তু সে তোমাকে ভালবেসেছিল
কেননা তুমিও তাদের ক্ষমা করো নি
তুর্কি জাতির মুখে যারা মাখিয়েছে কলঙ্কের চুনকালি।
এ পাড়ার ক্ষয়রুগীরা
পঙ্গু বিছানায় শুয়ে
শার্সি-আঁটা জান্‌লার ওপারে তাকিয়ে আছে।
ধোপানী হুরিয়ে-র ছেলেটা
বিষণ্ণতা ঘাড়ে ক'রে
চলেছে কফিখানায়।

রহমী বে-র বেতারে
        খবর বলছে :
দূর প্রাচ্যের কোন দেশে
হল্‌দে চাঁদের মত গোলমুখ মানুষ
এক শ্বেতকায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে।
নিজের ভাইদের মারতে
সেই দূর দেশে ওরা পাঠিয়েছে
তোমার দেশের, তোমার জাতের
চার হাজার পাঁচ শো মহম্মদকে।

ক্রোধে আর লজ্জায়
আরক্ত তোমার মুখ
ওপর-ওপর ভাসা-ভাসা নয়
একান্ত আপন
        অসহায় এক বিষণ্ণতা।
        পেছন থেকে মুখ থুবড়ে ওরা মাটিতে ফেলে দিয়েছে

যেন তোমার স্ত্রীকে
        আর সে হারিয়েছে তার গর্ভের সন্তান।
কিম্বা আবার তুমি জেলে গেছ
আর তারা সেপাইয়ের উর্দি-পরা চাষীদের বাধ্য করছে
চাষীদের পেটাতে।

হঠাৎ অতর্কিত রাত্রি
বিকেলের বেড়ানো শেষ।
চেয়ে দেখ, তোমাদের রাস্তার দিকে মোড় নিল
        পুলিশের একটা গাড়ি
আর তোমার স্ত্রী ফিস্‌ফিসিয়ে বলল :
—আমাদের বাড়িতে নয় তো ?

